সূচীপত্র

কৃত্তিবাস

বাংলাদেশে তখন হিন্দু রাজার রাজত্বকাল। প্রবলপ্রতাপ রাজা গণেশ তখন বাংলায় রাজত্ব করিতেছেন। রাজা বিদ্যানুরাগী, গুণগ্রাহী, বিদ্বজ্জনের আশ্রয়স্থল—জ্ঞানী ও গুণিজনে তাঁহার সভা পরিপূর্ণ। কত শত যাচক, কত পণ্ডিত যে তাঁহার প্রাসাদদ্বারে প্রতিদিন অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া আসিয়া উপস্থিত হ'ন, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজা কাহাকেও বিমুখ করেন না, মুক্তহস্তে সকলকেই খুশী করিয়া বিদায় দেন।

একদিন প্রভাতে রাজা গণেশের সিংহদ্বারে এক ব্রাহ্মণ যুবক আসিয়া উপস্থিত। যুবক অল্প কিছুদিন পূর্বে গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। এখন তাঁহার সাধ—রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি রাজার সভাকবি হইবেন।

এই যুবক—কবি কৃত্তিবাস। ইনিই বাংলা রামায়ণের আদি কবি। ইনিই সর্বপ্রথম বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই

কবির পরে আরও অনেক কবি বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের যশ কেহই ম্লান করিতে পারেন নাই।

কৃত্তিবাস যখন রাজা গণেশের সিংহদ্বারে দ্বারীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের প্রভায় তাঁহার নয়ন দুটি যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! তিনি একটি ভূর্জপত্রে পাঁচটি শ্লোক লিখিয়া মহারাজকে উপহার দিবার জন্য দ্বারীকে দিলেন।

কত শত প্রার্থীই ত এমনিভাবে রাজসন্দর্শনে আসিয়া থাকে। সুতরাং তরুণ যুবক কৃত্তিবাসের শ্লোক পাইয়া দ্বারীর কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না। সে যথারীতি শ্লোকগুলি লইয়া রাজার কাছে উহা পৌঁছাইয়া দিতে গেল। রাজা তখন পাত্রমিত্রবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় উপবিষ্ট। ব্রাহ্মণ যুবক কৃত্তিবাস সিংহদ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরেই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সেই দ্বারী ফিরিয়া আসিয়া হাঁকিল:

কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হইল, করহ সম্ভাষ॥

অতঃপর কৃত্তিবাসকে সঙ্গে লইয়া দ্বারী তাঁহাকে রাজসভায় পৌঁছাইয়া দিল। রাজসভায় পৌঁছিয়া কৃত্তিবাস দেখিলেন, পলিতকেশ ভারতবিখ্যাত কত পণ্ডিত রাজাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কৃত্তিবাসের বুক একবার দুরুদুরু করিয়া উঠিল—কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিজ প্রতিভার পরিচয় দিবার জন্য সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মুখে মুখে শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকটি শ্লোক অপূর্ব, তাহাতে যুগপৎ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় সুপরিস্ফুট।

গুণগ্রাহী রাজা কৃত্তিবাসের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং মাল্য, চন্দন, পট্টবস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি বহু দ্রব্য দিয়া কবিকে পুরস্কৃত করিলেন। এত দান করিয়াও রাজা প্রাণে তৃপ্তি পাইলেন না। তিনি কৃত্তিবাসকে তাঁহার সভাকবির পদে বরণ করিলেন এবং তাঁহাকে বাল্মীকি-রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিলেন। কৃত্তিবাসের মনের সাধ পরিপূর্ণ হইল। তিনি বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রাচীন বাংলার কবিদিগের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, তাহা তাঁহারই রচিত রামায়ণের অন্তর্গত আত্মপরিচয় হইতে। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা পূর্ববঙ্গে বাস করিতেন। সেখান হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে বর্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে তাঁহারা বাস করিতে থাকেন। ফুলিয়া তখন সমৃদ্ধ স্থান—'গ্রামরত্ন' বলিয়া বিখ্যাত। কৃত্তিবাস নিজেকে মুরারি ওঝার নাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম বনমালী ওঝা। ওঝা ইঁহাদের পাণ্ডিত্য-জ্ঞাপক কুলোপাধি—ইঁহারা মুখোপাধ্যায়-বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ।

কৃত্তিবাসের জন্ম হয় 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস'—বাণীপূজার শুভদিনে সরস্বতীর বরপুত্র এই কবি ভূমিষ্ঠ হ'ন। বারো বৎসর বয়সে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হইয়াছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন :

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার॥

কোনও প্রবীণ তেজস্বী অধ্যাপকের নিকট কবির বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। বিদ্যালাভ সাঙ্গ হইলে তিনি গুরুদেবের শুভ আশীর্বাদ পাইয়া গুরুগৃহ হইতে বিদায় লন। পণ্ডিত বলিয়া এই সময়েই কৃত্তিবাসের প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণের মধ্যেও অনেক জায়গায়ই নিজেকে পণ্ডিত, পুরাণজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁহার কাব্যের অনেক জায়গায় আছে। কিন্তু কৃত্তিবাসের যশ পাণ্ডিত্যের জন্য নহে, তাঁহার যশ কবিত্বের জন্য। তিনি প্রকৃত কবি ছিলেন। সরস্বতীর অনুগ্রহে তাঁহার কবিত্ব উৎসারিত হইত। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দ নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥

কৃত্তিবাসের অন্তরের কামনা ছিল যে, তিনি সর্বত্র সম্মানিত হইবেন,—তাঁহার সুনামসৌরভ চিরস্থায়ী হইবে। সেইজন্যই শিক্ষা-সমাপনান্তে তিনি গৌড়েশ্বরের সভাকবি হইবার অভিলাষে গৌড়ে গিয়াছিলেন। এই সাক্ষাৎকারে ঐহিক কোন লাভের আশা কৃত্তিবাসের ছিল না,—তাহা যদি থাকিত, তবে তাঁহার শ্লোক শুনিয়া গৌড়েশ্বর যখন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তিনি অনেক অর্থ-সম্পৎ প্রার্থনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। কবির যাহা শ্রেষ্ঠ কাম্য, অর্থাৎ গৌরব, তাহা ছাড়া কৃত্তিবাসের অপর কিছুই প্রার্থনীয় ছিল না। তাই রাজা তাঁহাকে সভাকবির পদে বরণ করাতেই তিনি পরম অনুগৃহীত হইয়াছিলেন। কবি ইহাকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসের আবির্ভাব হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে: কারণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোথাও শ্রীচৈতন্যদেবের নাম নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে যদি তাঁহার রামায়ণ রচিত হইত, তবে কোথাও না কোথাও—কোন না কোন প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বা শ্রীচৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণব-ধর্মের কথা তাঁহার রামায়ণের মধ্যে থাকিত। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যের উপর শ্রীচৈতন্যদেবের ছিল এমনই প্রভাব। সুতরাং কৃত্তিবাসী রামায়ণের রচনাকাল প্রাক্-চৈতন্য যুগে।

রামায়ণ ভিন্ন 'যোগাদ্যার বর্ণনা', 'শিবরামের যুদ্ধ', 'রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী' প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিতেও কবি কৃত্তিবাসের ভণিতা দেখা যায়। কিন্তু কবির যশ ঐ সকল কাব্য রচনার জন্য নহে, তাঁহার যশ রামায়ণ রচনার জন্য।

কত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে—সেই যে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়া গেলেন, তাহার জনপ্রিয়তা বা কবির যশ আজিও এতটুকু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। আজিও মিতব্যয়ী বণিক ক্ষুদ্র দীপাধার তৈলপূর্ণ করিয়া রামায়ণ কাব্যখানিকে একবার মাথায় ঠেকাইয়া পরম ভক্তির সহিত অর্ধরাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া উহা পাঠ করিতে থাকে। পড়া শেষ হইয়া গেলে, একটি তেজপাতার চিহ্ন দিয়া বইখানি যখন সযত্নে মুড়িয়া রাখিয়া দেয়, তখন সে

অনুভব করে যে ভাবে ও ভক্তিতে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আবার ধনীর প্রাসাদে উজ্জ্বল দীপালোকে ধনিগণও সমান ভক্তি ও অনুরাগের সহিত এই রামায়ণ কাব্যখানি বহু শতাব্দী ধরিয়া পাঠ করিয়া আসিতেছেন।

প্রাচীন বাংলার যে সকল কবি কাব্যরচনা করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় চিরদিনের জন্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কৃত্তিবাস অন্যতম। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালীর নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মজীবনে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার মধ্যে শিক্ষা করিবার বিষয় আছে অনেক। আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ অনুচরের চিত্র রামায়ণে দেখিতে পাই। দশাননের বিক্রম, ইন্দ্রজিতের তেজ, লক্ষ্মণের সংযম, রামের বীর্য, সত্যানুরাগ ও সহিষ্ণুতা মনের মধ্যে একটা দাগ রাখিয়া যায়। ইহার মধ্যে ভগবানের স্তব, ভক্তির কথাই বা কি সুন্দর! যুদ্ধের বর্ণনা করিতেও কবি কত সুপটু! করুণরসের ন্যায় বীররসের উদ্দীপনাও এই কাব্যপাঠে ঘটিয়া থাকে।

মানুষের কল্পনায় যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহৎ—সে সমস্তই কৃত্তিবাসী রামায়ণে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পিতার প্রতি পুত্রের আনুগত্য, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার স্নেহ-মমতা, পতি-পত্নীর ভালবাসা, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য প্রভৃতি চমৎকারভাবে রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। দশরথের সত্যনিষ্ঠা, রামের পিতৃভক্তি, সীতার পতিপ্রেম, হনুমানের প্রভুভক্তি এবং রাম-লক্ষ্মণ-ভরতের সৌভ্রাত্র—এ সকলই আজিও আমাদের দেশে আদর্শ হইয়া আছে। রামচন্দ্র সীতাকে শুদ্ধ-চরিত্রা জানিয়াও বিসর্জন দিয়া যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, উহা অপেক্ষা প্রজানুরঞ্জনের উজ্জ্বলতর আদর্শই বা আর কি হইতে পারে?

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার জীবনে দুঃখের পর দুঃখ আসিয়াছে, কিন্তু এক-দিনের জন্যও তাঁহারা স্বধর্ম বা কর্তব্যপথ হইতে বিচলিত হ'ন নাই। শত দুঃখে জর্জরিত হইয়াও রামের পিতৃভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, সত্যানুরাগ অপরি-বর্তিত ছিল, প্রজানুরঞ্জন অমলিন ছিল। শত পরীক্ষাতেও সীতার পতিভক্তি অবিচলিত ছিল; রাম-লক্ষ্মণ-ভরতের সৌভ্রাত্র অটুট ছিল। যুগে

যুগে ইতিহাসের বিবর্তন ঘটে, কিন্তু রামায়ণে যে উজ্জ্বল আদর্শ আছে তাহার পরিবর্তন হয় না। ইহা চিরন্তন মানব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু রামায়ণের মূল্য কমে নাই। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে সমান আদরে ইহা পঠিত হইতেছে। এই রামায়ণ বাঙ্গালীর আনন্দের উৎস, বাঙ্গালীর জীবনগঠনে ও নিয়ন্ত্রণে এক প্রধান সহায়। তাই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

"ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে জলে ও শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়া যেমন আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল জোগাইয়া আসিয়াছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত তেমনি করিয়া আমাদের মনের অন্নপানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থ না থাকিলে, আমাদের মানস-প্রকৃতিতে যে কিরূপ শুষ্কতা ও চিরদুর্ভিক্ষ বিরাজ করিত, তাহা আজ আমাদের কল্পনা করাও কঠিন।"

রামায়ণ মুখ্যতঃ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাব্য হইলেও রাজধর্ম ও তাহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেকালে রাজধর্ম, সতীধর্ম, সৌভ্রাত্র এবং সত্যপালনের আদর্শ কি ছিল, তাহা আমরা এই একখানি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। সেকালের রাজার আদর্শ রাম। প্রজার আদর্শরক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য তিনি পতিপরায়ণা সীতাকে বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রজাদিগের ধর্ম ও সুখের কাছে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতেন। সেকালের পিতৃভক্তির আদর্শও রামচন্দ্র। ভ্রাতার আদর্শ ভরত ও লক্ষ্মণ। পত্নীর আদর্শ সীতা—তাঁহার মত অগাধ বিশ্বাস, গভীর প্রেম, অসীম ধৈর্য এবং অতুলনীয় ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল নারী জগতের সাহিত্যে আর কোথায়? সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের যাহা কিছু মাধুর্য ও মহত্ত্ব, তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণে আশ্চর্য কুশলতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। তাই রামায়ণের প্রভাব আমাদের জীবনে সর্বাধিক।

অনেক কবিই বাংলায় রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তথাপি

কৃত্তিবাসের এত জনপ্রিয়তার কারণ কি? তাঁহার রামায়ণ সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ হইলেও উহার মধ্যে অনুবাদের আড়ষ্ট ভাব বা কৃত্রিমতা নাই। কৃত্তিবাস বাল্মীকি-রামায়ণের হুবহু অনুকরণ করেন নাই, উপাখ্যানগুলির মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। তিনি বাল্মীকির অনেক আখ্যানকে নিজের মনোমত করিয়া সাজাইয়া বসাইয়াছেন—কোন আখ্যানকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন, আবার কোন আখ্যানকে ইচ্ছামত বিস্তারিত করিয়া বলিয়াছেন। বাল্মীকির অনেক আখ্যান তিনি বাদ দিয়াছেন, আবার পুরাণ হইতে অনেক নূতন গল্প যোজনা করিয়া তাঁহার রামায়ণকে সাজাইয়াছেন। সুতরাং অনুবাদ হইলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবির সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় আছে, কবির স্বকীয় কল্পনা, কবিত্ব ও বর্ণনাকৌশলের নিদর্শন আছে। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনেকাংশে কবির মৌলিক সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে বাল্মীকির মূল কাহিনী অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর ভাবে ভাবিত হইয়া এক স্বতন্ত্র রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে পার্থক্য বড় অল্প নহে।

বাল্মীকি-রামায়ণে রাম-চরিত্র এক বিশাল চিত্র। বীরত্বে ও কঠোরতায় তিনি এক সুমহান্ পুরুষ। দৃঢ়তায় ও বীরত্বে তিনি বজ্রের মত কঠোর, কিন্তু তাঁহার মন ফুলের অপেক্ষাও কোমল। এক কথায় বলিতে গেলে, বাল্মীকির অঙ্কিত রামচন্দ্র কোমলতা ও কঠোরতার অপরূপ এক সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র মুখ্যতঃ কোমলতারই প্রতিমূর্তি। রামের বীরত্ব ও বৈরাগ্যের মহিমা সেখানে তত বড় হইয়া দেখা দেয় নাই; কৃত্তিবাস তাঁহাকে শ্যামসুন্দর পল্লবের মত স্নিগ্ধ কোমল করিয়া গড়িয়াছেন। এই বিষয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কয়েকটি চমৎকার মন্তব্য করিয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণের রামচন্দ্র ঊনষোড়শবর্ষ বয়সে হরধনু ভাঙ্গিবার সামর্থ্য রাখিতেন: তাঁহার বক্ষ বিশাল, শূরত্বে ও বীরত্বে তিনি অদ্বিতীয়। সেখানে দেখি, কৌশল্যা রামের বনবাস উপলক্ষ্যে বনগত পুত্রকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, "রাম পুষ্পবৎ কোমল উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইত, এখন নিজের পরিঘোপম বাহুর উপর মস্তক রাখিয়া সেই রাম শয়ন

করিবে কিরূপে?" বীরত্বের মহিমায় রামকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্যই বাল্মীকি এইভাবে রামচন্দ্রের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রামেব এই চিত্র পাছে কঠোর হয়, এবং সেই কঠোর চিত্রটি পাছে কুসুমসুকুমার ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর কাছে প্রিয় না হয়, এইজন্য কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহার পরিঘোপম বাহুর কথা উল্লেখ করেন নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামের বাহু কিশলয়ের মত কোমল, তাঁহার 'নবনী জিনিয়া তনু অতি সুকোমল'। বাল্মীকি-রামায়ণে ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রের রুদ্র মূর্তি তাড়কা, মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসকে সন্ত্রস্ত করিয়াছে; মারীচ তাহার অনুসরণকারী রামচন্দ্রের তেজোদৃপ্ত মূর্তিটি স্মরণ করিযা বলিয়াছে, "বৃক্ষে বৃক্ষে আমি ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রের কঠোর মূর্তি দেখিতেছি।" কিন্তু কৃত্তিবাস রামের ধনুষ্পাণি কঠোর মূর্তি কল্পনা করিতে পারেন নাই; তাঁহার বর্ণনায় রামচরিত্রে এক কুসুমসুলভ কোমলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামচন্দ্রের এই কুসুমসুকুমার মূর্তিটি বাঙ্গালীর অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল—কারণ, বাঙ্গালী যে কোমল ভাবের ভাবুক, কোমলতারই উপাসক।

কৃত্তিবাস ছিলেন ভক্ত কবি,—রামের প্রতি অসীম ভক্তি লইয়া তিনি রামায়ণ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ খানিকটা ভাগবতের আকার ধারণ করিয়াছে। অবশ্য ইহাতে পরবর্তীকালের অনেক রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। রাম গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। অসভ্য বানরগণকে তিনি প্রেম দিয়া ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তিনি তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত। এমন কি, রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধকালে রাক্ষসেরাও তাঁহার প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়াছে। রামকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া রাবণের মত বীরও ভক্তি-গদগদচিত্তে বলিয়াছে :

জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক বহু নাহি সংখ্যা তার॥
অপরাধ মার্জনা করহ দয়াময়।
কুড়ি হস্ত জুড়ি রাবণ একদৃষ্টে রয়॥

প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভক্তির লীলায় পরিপূর্ণ। আচার্য দীনেশচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন,—ইহাতে যুদ্ধক্ষেত্রের দামামাধ্বনি যেন মৃদঙ্গ করতালের মৃদুতা ধারণ করিয়াছে, বীরত্বের ক্রীড়াক্ষেত্র যুদ্ধস্থল যেন হরি-ভক্তির লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

আদি কবি বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণে শুধু রামের চরিত্রে নহে, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতির চরিত্রেও ক্ষাত্রতেজ পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে ঐ সকল চরিত্রের বীরত্বের মহিমা অনেকখানি পরিত্যক্ত হইয়া উহারা কোমল মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। রাম-লক্ষ্মণের সৌহার্দ্য, কৌশল্যার শোক, সীতার গৃহবধূর ন্যায় ব্রীড়াবনত মাধুরী--এগুলিকে কৃত্তিবাস নিপুণ হস্তে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। বাল্মীকির রাম যেমন দৃঢ় ক্ষাত্রতেজের জ্বলন্ত প্রতীক, সীতাও তেমনি তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা। কিন্তু কৃত্তিবাসের সীতা বাঙ্গালী গৃহবধূ, পুষ্পস্তবকনম্রা কোমলা বল্লরীর মত তিনি মাধুর্যময়ী। বীবাঙ্গনার তেজস্বিতা তাঁহাতে নাই।

বাল্মীকি-রামায়ণ কৃত্তিবাসের হাতে এইরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়াই ইহা বাঙ্গালীর এত প্রিয় হইয়াছে। কৃত্তিবাস বাঙ্গালী ছিলেন,--বাঙ্গালীর ভাবধারা ও মনের প্রবণতা তিনি ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ভাবের ও মনের অনুরূপ করিয়া রামায়ণের কাহিনী ও চরিত্রগুলি তিনি স্থানে স্থানে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কাব্যের আবেদন বাঙ্গালীর কাছে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে।

বাল্মীকি-রামায়ণকে সম্মুখে রাখিয়া কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বাল্মীকি হইতে তিনি শুধু কাঠামোটা লইয়াছেন। এই কাঠামো অবলম্বন করিয়া বাংলার মাটি দিয়া তিনি প্রতিমা গড়িয়াছেন। তাই বাংলার স্থল-জল-আকাশের মাধুরী, বাংলার ফুল-ফল, ঘর-দুয়ার, বেশ-ভূষা, ভক্ষ্য-ভোজ্য, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-আমোদ, রীতি-নীতি এবং প্রেম, স্নেহ, মৈত্রী, ভক্তি, দাস্য, শ্রদ্ধা, নারীর ব্রীড়াবনত কোমলতা প্রভৃতি রামায়ণের মধ্যে স্যূত-অনুস্যূত রহিয়াছে।

কৃত্তিবাসের বলিবার ভঙ্গিটি অসাধারণ। তাঁহার রচনায় উপমার আতিশয্য

নাই, অলঙ্কারের বাহুল্য নাই,—সরলভাবে পূতচরিত্র এক আদর্শ পুরুষের কাহিনী তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ণনার এই সরল অকৃত্রিম মাধুর্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণকে সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বাঙালীর আদরের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে। আজিও সূর্যাস্তকালে গ্রামের উপর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ধীরে ধীরে ছায়া বিস্তার করে, দূর দেবালয় হইতে সান্ধ্য আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতে থাকে, ঝিল্লীর অবিশ্রাম ধ্বনি আসন্ন রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে থাকে,—তখন গ্রামবৃদ্ধ তাঁহার পিতৃ-পিতামহের আমলের শতছিন্ন কৃত্তিবাসী রামায়ণখানি খুলিয়া বসিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে সুর করিয়া পড়িতে থাকেন—আর তাঁহার চারিদিকে বালক-বালিকা ও বৃদ্ধা রমণীগণ অশ্রুসজল চক্ষে রামসীতার সেই অতি পুরাতন বিরহ-মিলন কাহিনী শুনিতে শুনিতে আনন্দ-বেদনায় আপ্লুত হইতে থাকে। কত রাজ্য-ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া যাইবে, কিন্তু বাঙ্গালীর চিত্তে কৃত্তিবাসের প্রভাব চিরদিনই অম্লান থাকিবে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে বিভিন্ন দেবদেবীর চরিত-মহিমা কীর্তন করিয়া, তাঁহাদের মংগলকর স্তব গান করিয়া এক শ্রেণীর কাব্য রচিত হইত; সেগুলি মংগলকাব্য নামে বিখ্যাত। এক একটি মংগল-কাব্যে বিশেষ কোন একটি দেবতাকে মংগলকারী প্রবল শক্তিসম্পন্ন জাগ্রত দেবতা রূপে অংকন করা হইত। এইরূপে মংগলচণ্ডী, মনসা, ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি দেবতার কাহিনী বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের কবিরা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মংগলচণ্ডী ও পৌরাণিক চণ্ডীকে অভিন্ন করিয়া লইয়া যে মংগলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীমংগল কাব্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এইরূপে মনসার কাহিনী লইয়া মনসামংগল, শীতলার কাহিনী লইয়া শীতলামংগল, ষষ্ঠীর কাহিনী লইয়া ষষ্ঠীমংগল,

ধর্মঠাকুরের কাহিনী লইয়া ধর্মমঙ্গল এবং দুর্গার কাহিনী লইয়া দুর্গামঙ্গল রচিত হয়। বাঘের দেবতা দক্ষিণের রায়কে লইয়া রচিত হয় রায়মঙ্গল কাব্য।

বাংলাদেশে সর্পের উপদ্রব চিরন্তন—প্রতি বৎসর শত শত লোক সর্প-দংশনে মারা যায়। তাই সর্পের দেবতা রূপে মনসাদেবী পূজিত হইলেন। তাঁহাকে মঙ্গলকারী প্রবল শক্তিসম্পন্ন দেবী রূপে কল্পনা করিয়া লোকে চাঁদ সদাগর ও বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী রচনা করিয়া দেখাইল, মনসা-দেবীর নিগ্রহে ও অনুগ্রহে কিরূপে মানুষের জীবনে উপর্যুপরি বিপদ ও সম্পদ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার পূজা করিলে তাঁহার অনুগ্রহে কেবল যে সর্পভীতি কাটিয়া যায় তাহা নহে, বিপদের জাল হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ নিশ্চিন্তভাবে সকলপ্রকার সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিতে পারে।

ঠিক এই ভাবেই মঙ্গলকারিণী শক্তি রূপে দেবী মঙ্গলচণ্ডী পূজিতা হইলেন। মানুষের জীবনে রোগ, শোক, দারিদ্র্য আসে,—আসে কত অশান্তি, কত ভাগ্যবিপর্যয়। কিন্তু চণ্ডীর উপাখ্যান রচনা করিয়া কবিরা মানুষকে, তথা সমাজকে দেখাইলেন—চণ্ডীর কৃপায় দীন অভাজনও অকস্মাৎ রাজার মত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতেছে, বিপন্ন তাঁহার কৃপায় উদ্ধার পাইতেছে. দেবীর অনুগ্রহে তাঁহার পূজক ভক্তদিগের প্রচুর আর্থিক সমৃদ্ধিলাভ ঘটিতেছে। আবার চণ্ডীর পূজা না করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়া মানুষের জীবনের সকল সুখ-সম্পদ নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের ঘটিতেছে বন্ধন ও কারাবাস। জনসাধারণ এই সকল কাহিনী পড়িয়া চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতি আস্থাবান্ হইয়া তাঁহাদের পূজা করিতে শিখিয়াছিল। দেবদেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য রচিত হইয়াছিল।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীর উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া অনেক কবিই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী কবি ছিলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। 'কবিকঙ্কণ' ইঁহার উপাধি। ইহার অর্থ কবিদিগের মধ্যে ইনি 'কঙ্কণ' অর্থাৎ ভূষণ বা অলঙ্কারস্বরূপ,—সর্বশ্রেষ্ঠ। সম্ভবতঃ

মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলের আরড়া গ্রামের জমিদার কাব্যানুরাগী রঘুনাথ রায় স্বীয় গুরু মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার পশ্চিমে, বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণায় দামুন্যা নামক গ্রামে মুকুন্দরামের পৈতৃক নিবাস ছিল। ঐ স্থানেই তাঁহার জন্ম হয়। কবির পিতামহের নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। 'মিশ্র' ইঁহাদের নবাবদত্ত উপাধি, ইঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। প্রায় সাত পুরুষ ধরিয়া ইঁহারা দামুন্যা গ্রামে বসবাস করিতেছিলেন। মুকুন্দরাম অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। মামুদ সরীপ নামে এক অত্যাচারী মুসলমান ডিহিদারের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া মুকুন্দরামকে সপরিবারে তাঁহার জন্মভূমি দামুন্যা পরিত্যাগ করিতে হয়। অবশেষে তিনি মেদিনী-পুরের উত্তরাংশে আরড়া গ্রামে গিয়া সেখানকার জমিদার বাঁকুড়া রায়ের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সম্বর্ধনাসূচক কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন। বাঁকুড়া রায় জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করিতেন। তিনি মুকুন্দরামের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া সহায়সম্বলহীন দরিদ্র কবিকে আশ্রয় দান করিলেন, ধনদৌলত দিলেন এবং নিজপুত্র রঘুনাথের শিক্ষাগুরুপদে নিযুক্ত করিলেন। কবির ভাগ্য ফিরিল।

দামুন্যা হইতে আরড়া গ্রামে আসিবার পথে দেবী চন্ডী ক্ষুধার্ত ও নিদ্রাভিভূত কবি মুকুন্দরামকে স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনার আদেশ দিয়াছিলেন।

দেবী চন্ডী মহামায়া,
দিলা চরণ-ছায়া,
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।

সেকালের প্রায় সকল কবিই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। মুকুন্দরামও স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মুকুন্দরাম পন্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা বেশ ভালই জানিতেন। কবির বিবিধ বিদ্যাবত্তা ও পান্ডিত্যের পরিচয় তাঁহার কাব্যেই রহিয়াছে। মুকুন্দরাম সঙ্গীতানুরাগীও ছিলেন।

মুকুন্দরাম চণ্ডীর আদেশে মঙ্গলচণ্ডীর গান রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে শাক্ত ছিলেন, এই অনুমান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কবির 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য পাঠ করিয়া বিচার করিলে মনে হয় যে, তিনি শাক্ত ছিলেন না তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। কাব্যের সর্বত্রই কবির অকৃত্রিম হরিভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

মুকুন্দরামের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ; তবে সঠিকভাবে তাঁহার জন্মকাল জানা যায় নাই।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যখানি ছাড়া মুকুন্দরাম আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। দামুন্যায় থাকিতে তিনি 'শিবকীর্তন' কাব্যখানি রচনা করেন। 'জগন্নাথমঙ্গল' কবির প্রথম বয়সের রচনা। কিন্তু 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যখানি মুকুন্দরামের পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি। ইহারই উপর বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অমরত্বের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত। নিপুণ চরিত্রচিত্রণে, দুঃখের করুণ বর্ণনায় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যখানি মধুর ও বাস্তবরসসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কল্পনার রঙীণ কাচের মধ্য দিয়া তিনি কোথাও কোন চরিত্র অথবা চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। ষোড়শ শতকের সমাজজীবন ও মানবজীবনের বাস্তব চিত্রই তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুইটি কাহিনী আছে; একটি কালকেতুর কাহিনী, অপরটি ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী।

দেবরাজ ইন্দ্র নিত্যানিয়মিত শিবপূজা করিতেন। একদিন ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর পূজার জন্য ফুল তুলিয়াছেন। সেই ফুলের একটির মধ্যে এক কীট ছিল -- নীলাম্বর তাহা জানিতে পারেন নাই। ইন্দ্র ঐ ফুলটি শিবের মাথায় পূজার অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিলে কীটটি মহাদেবকে দংশন করিল। দংশনের জ্বালায় অস্থির হইয়া মহাদেব নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন—তুমি পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর, দেবলোকে তোমার স্থান নাই। এই অভিশাপের ফলে নীলাম্বর পৃথিবীতে মানুষের ঘরে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পত্নী ছায়াও স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়া পৃথিবীতে আসিলেন। স্বর্গলোকের দেবরাজ-

পুত্র এই নীলাম্বর কালকেতু রূপে ধর্মকেতু ব্যাধের ঘরে জন্মিলেন, আর ছায়া ফুল্লরা নামে সঞ্জয়কেতু ব্যাধের ঘরে জন্মিলেন।

এই যে নীলাম্বর মহাদেবের শাপে কালকেতু হইয়া পৃথিবীতে জন্মিলেন, ইহা চণ্ডীর ইচ্ছায়—তাঁহার কৌশলেই হইয়াছিল। নীলাম্বর পৃথিবীতে কালকেতু হইয়া না জন্মাইলে চণ্ডীর পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হয় না। তাই চণ্ডীর মায়াতেই নীলাম্বরের তোলা ফুলের মধ্যে কীট আবির্ভূত হইয়া মহাদেবকে দংশন করিয়াছিল।

কালকেতু দেবতার অবতার, কিন্তু কবি মুকুন্দরাম তাহাকে মানুষ হিসাবেই অংকন করিয়াছেন; তাহার চরিত্রে দেবতার অলৌকিকত্ব ফুটাইয়া তুলিয়া কোথাও তাহাকে অস্বাভাবিক করিয়া তুলেন নাই। সে ব্যাধের ছেলে—ব্যাধের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত, ঠিক তেমন ভাবেই কালকেতুর চরিত্র 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে। কৃত্রিম সাজসজ্জায় বা অস্বাভাবিক আচার-ব্যবহারে তাহার স্বাভাবিক রূপটি কোথাও ঢাকা পড়ে নাই। তাহার গলায় জালের কাঁঠি, হাতে লোহার শিকল, বুকে বাঘ-নখ, গায়ে রাঙ্গা ধূলি, মাথার চুলগুলি শিকার ধরিবার জন্য ছুটিবার সময়ে পাছে উড়িয়া আসিয়া চোখের উপর পড়িয়া তাহার অব্যর্থ লক্ষ্যকে নষ্ট করে এই সম্ভাবনায় জালের দড়ি দিয়া বাঁধা। তাহার—

নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার শাবল।
রূপ গুণ শীল বাড়া বাড়ে যেন শাল কোঁড়া
জিনি শ্যাম চামর-কুন্তল॥

ছেলেবেলা হইতেই কালকেতুর দেহে শক্তি ছিল অসীম। সে বনের ভল্লুক আর বানর ধরিয়া অবলীলায় খেলা করিত। শিশুদের দলের সে ছিল সর্দার। তাহার গতি এত দ্রুত ছিল যে, সে তাড়িয়া শজারু ধরিত। পাখী-গুলিকে সে বাঁটুল দিয়া বিঁধিত।

কালকেতুর বাল্যকালীন অসামান্য তেজ যৌবনে আরও বর্ধিত হইল। এখন সে নিত্য বনে যাইয়া শিকার করিত। বাঘ দেখিলে উহাকে লেজ মোচড়াইয়া

মারিত। কেবল সিংহকে সে বধ করিত না, কারণ সিংহ যে দুর্গার বাহন! কিন্তু মধ্যে মধ্যে ধনুকের বাড়ি দিয়া দুষ্ট সিংহকে সে এমন শিক্ষা দিত যে, সেই প্রচন্ড আঘাতের ফলে পশুরাজ আকুল হইয়া কোনও জলাশয় হইতে জল পান করিয়া তবে সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ হইত।

বীর কালকেতু সারাদিন বনে বনে শিকার করিয়া ফিরিত। সন্ধ্যাকালে সে লতায় বাঁধিয়া মৃত পশুর ভাব লইয়া গৃহে ফিরিত। রাত্রে সে ভোজন করিত প্রচুর অল্পে তাহার পেট ভবিত না। হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত, নেউল-পোড়া, পুঁইশাক আর কাঁকড়া -এমনি সব খাবার খাইয়া তবে তাহাব ক্ষুধা শান্ত হইত। সে যখন খাইতে বসিয়া গ্রাস তুলিত তখন সেই গ্রাসগুলিকে দেখিয়া মনে হইত,—যেন এক একটি 'তে আঁটিয়া তাল'। কবি মুকুন্দরাম কালকেতুব ভোজন-পর্বের চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। কালকেতুব বড় বড় গোঁফ ছিল। সেই গোঁফ পাছে তাহার খাদ্যের সংগে জড়াইয়া যায়, সেইজন্য উহা সে প্রথমে ঘাড়ে বাধিয়া লইত, তাহার পর আহারে প্রবৃত্ত হইত।

মুচড়িয়া দুই গোঁফ বাঁধি লয় ঘাড়ে।
এক শ্বাসে দশ হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চার হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।
ছয় হাঁড়ি মসুর সুপ মিশাইয়া লাউ॥

কালকেতুর বয়স যখন এগার, তখন তাহার সহিত সঞ্জয়কেতু ব্যাধের কন্যা ফুল্লরার বিবাহ হইয়াছিল। ফুল্লরা মেয়েটি ছিল বড় লক্ষ্মী—রূপে গুণে অতুলনীয়া। ব্যাধের জীবন দুঃখময়। ফুল্লরা তাহার স্বামীর সহিত ব্যাধজীবনের সকল দুঃখ হাসিমুখেই সহ্য করিত। নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া এই ব্যাধ-দম্পতি তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাদের সংসারে শান্তি ছিল। তাহাদের অভাব-অনটন ছিল, কিন্তু মনের প্রসন্নতা তাহাতে লোপ পায় নাই।

একদিন কালকেতু শিকারে বাহির হইল। যাত্রার সময়ে সে অনেক শুভ-চিহ্ন দেখিয়া রওয়ানা হইয়াছিল। দক্ষিণে গো-ব্রাহ্মণ ও বিকশিত পদ্ম

তাহার চোখে পড়িয়াছিল, বামে শৃগাল ও পূর্ণ ঘট সে দেখিয়াছিল। ইহাতে বীরের মন আশায় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল,—আজ ঘরে কিছু নাই, কিন্তু তাহাতে আক্ষেপ নাই—শিকার আজ ভালই মিলিবে! কিন্তু শিকারের অন্বেষণে যাইতে যাইতে পথে একটা সোনালি রঙের গোসাপ দেখিয়া কালকেতুর সকল আশা-আনন্দ দূর হইয়া গেল, তাহার ক্রোধ হইল। কারণ, গোসাপ যাত্রার পক্ষে শুভ চিহ্ন নহে। ক্রুদ্ধ কালকেতু উহাকে ধনুকের গুণে বাঁধিয়া লইল এবং মনে মনে বলিল, "যদি অন্য শিকার কিছু মিলে, তবে ইহাকে মুক্তি দিব। নতুবা ইহাকেই শিকপোড়া করিয়া খাইব।"

সেদিন কালকেতু বনে বনে ঘুরিয়া কিছুই পাইল না। বনের সকল অংশ ঘন কুয়াসায় ঢাকা, কোন পশুপক্ষী দেখা যায় না। ব্যর্থমনোরথ হইয়া কালকেতু দিনের শেষে ঐ গোসাপটিকে লইয়াই গৃহে ফিরিল।

ফুল্লরা কালকেতুকে খালি হাতে ফিরিতে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘরে যে তাহাদের একটি ক্ষুদও নাই, কি দিয়া তাহারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করিবে? কালকেতু বলিল, "এই গোসাপটার ছাল ছাড়াইয়া ইহাকে পোড়াও, আর প্রতিবেশী কাহারও কাছ হইতে সামান্য কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া আন।"

স্বামীর কথায় ফুল্লরা প্রতিবেশিনীর গৃহে ক্ষুধ ধার করিতে গেল, কালকেতু গেল গোলাহাটে লবণ কিনিবার জন্য। সেই সোনালি গোসাপটি আবদ্ধ অবস্থায় কালকেতুর ভাঙা কুঁড়ের একপাশে পড়িয়া রহিল।

গোসাপটি কিন্তু আসলে গোসাপ নয়। দরিদ্র কালকেতুর প্রতি সদয় হইয়া তাহার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করিবার অভিলাষে স্বয়ং চণ্ডী গোসাপের রূপ ধারণ করিয়া কালকেতুর গৃহে আসিয়াছেন। সুতরাং ফুল্লরা আর কালকেতু কুটীর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই—

হুঙ্কারে ছিঁড়িয়া দড়ি পরিয়া পাটের শাড়ী
ষোলো বছরের হৈল রামা।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী
কিবা দিব রূপের উপমা॥

সেই গোসাপ কোথায় মিলাইয়া গেল! তাহার স্থানে এক অতুলনীয় রূপলাবণ্যময়ী ষোড়শী যুবতী সেখানে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রূপের ছটায় কালকেতুর ভাঙগা কুঁড়েখানি যেন ঝলমল করিতে লাগিল।

ফুল্লরা প্রতিবেশিনীর কাছ হইতে ক্ষুদ লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আর বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। আশ্চর্য হইয়া সে সেই সুন্দরীকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে দেবী চণ্ডী যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া ফুল্লরার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। ফুল্লরাকে পরিহাস করিয়া দেবী বলিলেন :

শুনগো আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরী।
আইলুঁ বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি॥
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার স্বামী বাঁধি নিজ গুণে॥
তুমি গো ফুল্লরা যদি দাও অনুমতি।
এই স্থানে কতদিন করিব বসতি॥

ধনুকের গুণে বাঁধিয়া আনার কথা মনে করিয়াই দেবী বলিয়াছিলেন—'বাঁধি নিজ গুণে'। কিন্তু ফুল্লরা বিপরীত বুঝিল,—সে বুঝিল যে ঐ ষোড়শী যুবতীকে বুঝি তাহার স্বামী রূপে-গুণে আকৃষ্ট করিয়াই আনিয়াছে। সেইজন্য নানাভাবে বুঝাইয়া, নানাপ্রকার অনুনয়বিনয় করিয়া ফুল্লরা তাঁহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন ফুল্লরা তাহাদের দুঃখদারিদ্র্যের কথা তাঁহাকে জানাইল।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী।
ভাঙা কুঁড়েঘর তালপাতার ছাউনী॥
কত নিবেদিব দুখ, কত নিবেদিব দুখ।
দরিদ্র হইল স্বামী, বিধাতা বিমুখ॥

কিন্তু ফুল্লরার শত কাতর অনুনয়েও যুবতীরূপিণী চণ্ডী কিছুমাত্র বিচলিতা হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, তিনি ব্যাধের কুটীরে দারিদ্র্যের

মধ্যেই থাকিবেন। তাঁহার প্রচুর ধনরত্ন আছে। তাহা প্রদান করিয়া তিনি কালকেতু ও ফুল্লরার দারিদ্র্য মোচন করিবেন।

বেগতিক দেখিয়া ফুল্লরা স্বামীর কাছে গোলাহাটে ছুটিল। সেখানে গিয়া সে কালকেতুর নিকট সকল ব্যাপার বর্ণনা করিল। কালকেতু তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না। মনের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত ফুল্লরার সহিত সে কুটীরের দিকে ফিরিতে লাগিল। তারপর--

দূর হৈতে দেখে বীর আপনার বাসে।
তিমির কেটেছে যেন তপন-তরাসে॥

কুটীরে ফিরিয়া কালকেতু দেখিল ফুল্লরার কথা সত্য। এক অনিন্দ্য-সুন্দরীর রূপের প্রভায় তাহার কুঁড়েঘরের আঁধার বিদূরিত হইয়াছে।

এইবার কালকেতু সেই ষোড়শীকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল--কত উপদেশ দিল, কত অনুনয় করিল তাহার কুঁড়েঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে। কিন্তু দেবী নিরুত্তর, নিশ্চল! অতঃপর কিছুতেই ঐ ষোড়শীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না এবং তাঁহাকে তাড়াইতে পারা যাইতেছে না দেখিয়া কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার ধনুতে বাণ জুড়িল। কিন্তু বাণ সে ছুঁড়িতে পারিল না—স্তম্ভিত হইয়া সেই স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হাতের ধনুর্বাণ হাতেই রহিল। তখন—

শরধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে।
করুণা করিয়া মাতা বলে ধীরে ধীরে॥
আমি চণ্ডী আইলাম তোরে দিতে বর।
লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃশর॥

এই কথা বলিয়া দেবী দশভুজার মূর্তি ধারণ করিয়া কালকেতু ও ফুল্লরার সন্দেহভঞ্জন করিলেন। কালকেতু ও ফুল্লরা দেবীকে তাহাদের কুঁড়ে হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

অতঃপর চণ্ডী কালকেতুকে একটি মাণিক্যের আংটি ও সাত ঘড়া ধন দান করিলেন। এই সাত ঘড়া ধন কালকেতু আর ফুল্লরা বহন করে কেমন করিয়া? তাই কালকেতু দেবীকে অনুরোধ করিল—"মা! এক ঘড়া ধন তুমি আপনি কাঁখে করিয়া বহিয়া দিয়া আমাদের সাহায্য কর।" এই অনুরোধ-টুকুর মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে কালকেতুর সরলতা। দেবীকে সে বন্দনা করিয়াছে, আবার শিশুর মত সরলচিত্তে তাঁহার কাছে আব্দার করিয়াছে। দেবী চণ্ডীও কালকেতুর শিশুসুলভ সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

চণ্ডীর নিকট হইতে ধনরত্ন পাইয়া কালকেতুর ভাগ্য ফিরিয়া গেল। চণ্ডী কালকেতুকে বলিয়াছিলেন গুজরাটের বন কাটাইয়া নগর বসাইতে। চণ্ডীর আদেশে সে গুজরাটের বন কাটাইয়া নগর বসাইল। সেই নগর ঐশ্বর্যে যেন ঝলমল করিতে লাগিল।

একবার কালকেতুর সহিত কলিঙ্গরাজের এক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কালকেতুর পরাজয় ঘটে। কিন্তু কলিঙ্গাধিপতিকে দেবী চণ্ডী স্বপ্নাদেশ দিলেন—"কালকেতু আমার সেবক। তাহাকে তুমি গুজরাটের রাজপদ ছাড়িয়া দাও।" স্বপ্নাদেশের ফলে কালকেতু গুজরাটের সিংহাসন ফিরিয়া পাইল।

ইহার পর একদিন কালকেতু ও ফুল্লরার শাপান্ত হইল। তাহারা স্বর্গে চলিয়া গেল। জগতে চণ্ডীর পূজা প্রবর্তিত হইল। কারণ, সকলে এই উপাখ্যানের মধ্য দিয়া দেখিল যে, চণ্ডীর কৃপা লাভ করিলে দরিদ্রের দারিদ্র্যদশা দূরীভূত হয়—চণ্ডীর অনুগ্রহেই কালকেতুর মত সাধারণ মানুষ অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতে পারে। আবার, দেবীর প্রতি ভক্তি থাকিলে কালকেতুর মতই বিপদে পড়িয়াও বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর কাহিনী ছাড়া আর একটি কাহিনী আছে, তাহা ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী। উজানী নগরে ধনপতি সদাগর নামে এক বণিক বাস করেন। তাঁহার অনেক ধনসম্পত্তি। তাঁহার দুই পত্নী—বড়টির নাম লহনা, ছোটটির নাম খুল্লনা। খুল্লনা মঙ্গলচণ্ডীর ভক্ত ... চণ্ডীর পূজা করেন।

কিন্তু ধনপতি সদাগর আর লহনা মঙ্গলচণ্ডীকে গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারা শিবের উপাসক। শিবভক্ত ধনপতি সদাগর কি কারণে চণ্ডীর প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছিলেন তাহাই ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে।

একবার উজানী নগরের রাজবাড়ীতে চন্দন ফুরাইল। রাজার আদেশে ধনপতি সদাগর সিংহলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রবাসযাত্রার জন্য সাতটি ডিঙ্গা বোঝাই হইল। সমুদ্রযাত্রায় কত বিপদ, তাই খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতে বসিল। লহনা গিয়া ধনপতিকে এই সংবাদ দিল। এই কথা শুনিয়া শিবোপাসক ধনপতি সদাগরের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি পূজারতা খুল্লনার কাছে গিয়া মঙ্গলচণ্ডীকে 'ডাকিনী দেবতা' বলিয়া তাঁহার ঘটে লাথি মারিলেন। শিব ছাড়া আর কোন দেবতাকে তিনি ভক্তি করিতেন না। তাই তিনি শিবকে স্মরণ করিয়াই ডিঙ্গায় চড়িলেন।

ইতিপূর্বে একবার ধনপতি যখন কার্যানুরোধে গৌড়ে গিয়াছিলেন, তখন সদাগরের অনুপস্থিতিতে লহনা খুল্লনাকে বড় কষ্ট দিয়াছিল। ধনীর গৃহিণী হইয়াও খুল্লনাকে ছাগল চরাইতে হইত। সে তখন ঢেঁকিশালে শুইত, চটের মত মোটা কাপড় পরিত, খাইত পুরানো ক্ষুদ আর আলুনি তরকারি। বড় দুঃখে খুল্লনার দিন কাটিয়াছিল। তখনই সে মঙ্গলচণ্ডীর পূজাপদ্ধতি শিখিয়াছিল এবং দেবীর পূজায় তাহার দুঃখও দূর হইয়াছিল। এবার কিন্তু লহনা তাহার অনাদর করিল না। খুল্লনা ছিল গর্ভবতী। প্রসব-সময়ে লহনা তাহার যত্ন লইল। খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম হইল শ্রীমন্ত। চণ্ডীর অনুগ্রহে খুল্লনার শিশুপুত্রের রূপ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

ওদিকে ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যতরণী অকূল সাগরে পেঁছিতেই অপমানিতা চণ্ডী সদাগরকে বিপদে ফেলিলেন। চণ্ডীর মায়ায় সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠিল, সেই ঝড়ে একে একে ধনপতির ছয় ডিঙ্গা ডুবিল। মাত্র একটি ডিঙ্গা লইয়া ধনপতি সদাগর বাঁচিলেন এবং সিংহলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিংহলের নিকটবর্তী সমুদ্রে কালীদহে চণ্ডীর মায়ায় তিনি এক

আশ্চর্য দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন অনন্ত জলরাশির উপর এক মনোরম পদ্মবন—সেখানে রঙবেরঙের কত পদ্ম! তার মাঝে এক পরমাসুন্দরী রমণী-মূর্তি,—চারিদিক তাঁহার রূপের প্রভায় আলোকিত। তিনি বাম হস্তে একটি হস্তীকে তুলিয়া ধরিয়া একবার গিলিতেছেন, আবার উগরাইয়া হাত পাতিয়া লইতেছেন। ধনপতি সদাগর এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত, বিমুগ্ধ, স্তম্ভিত হইলেন।

কমলে-কামিনীর এই দৃশ্য ধনপতি সদাগর ভুলিতে পারিলেন না: সিংহলে পেঁছিয়া সিংহলরাজের সভায় তিনি কমলে-কামিনীর কথা বর্ণনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় কেহই বিশ্বাস করিল না। শেষ পর্যন্ত—

রাজা বলে সত্য যদি তোমার বচন।
অর্ধরাজ্য দিব আর অর্ধ সিংহাসন॥

—আর যদি ধনপতি সদাগরের কথা মিথ্যা হয়, তবে সদাগরকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।

সকলে তখন কালীদহে গেলেন। কিন্তু চণ্ডীর মায়ায় সেবার আর কমলে-কামিনী দেখা গেল না। কাজেই বারো বছরের জন্য সদাগর কারাগারে বন্দী হইলেন। চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়া আসার ফল ধনপতি সদাগর হাতে হাতেই পাইলেন।

ধনপতি সদাগর সিংহলরাজের কারাগারে বন্দী। ওদিকে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত বেশ বড়সড় হইয়া উঠিল। বড় হইয়া সে পিতার অন্বেষণে সিংহল যাত্রা করিল। চণ্ডীর ইচ্ছানুসারে স্বয়ং বিশ্বকর্মা আসিয়া তাহার জন্য সাতটি ডিঙ্গা তৈয়ারী করিয়া দিলেন। খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করিয়া, ছেলেকে নানা উপদেশ দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিল। পথে চণ্ডীর মায়ায় ভীষণ জলঝড় হইল। শ্রীমন্তের সপ্ত ডিঙ্গা বিপন্ন হইল। কিন্তু শ্রীমন্ত মায়ের উপদেশমত চণ্ডীকে স্মরণ করিল। অমনি সেই দারুণ দুর্যোগ কাটিয়া গেল। শ্রীমন্ত শ্রীক্ষেত্র ও সেতুবন্ধ পার হইয়া কালীদহে পেঁছিল। ধনপতি সদাগর এইখানে কমলে-কামিনী দেখিয়াছিলেন। শ্রীমন্তও এখানে আসিয়া কমলে-কামিনী দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

সিংহলরাজের কাছে গিয়া শ্রীমন্তও ধনপতি সদাগরের মত কালীদহের কমলে-কামিনীর অপূর্ব দৃশ্য বর্ণনা করিল। এবারেও রাজা বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে তর্ক হইতে হইতে এক অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষরিত হইল। রাজা স্বীকার করিলেন—শ্রীমন্ত যদি তাঁহাকে কমলে-কামিনী দেখাইতে পারে, তবে তিনি তাহাকে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা দিবেন, আর ব্যর্থ হইলে শ্রীমন্তের শিরশ্ছেদন করিবেন।

এবারও কালীদহে গিয়া সিংহলরাজ কমলে-কামিনী দেখিতে পাইলেন না। শ্রীমন্তের শিরশ্ছেদের আদেশ হইল।

শ্রীমন্ত মশানে নীত হইল। স্নান সারিয়া সে পিতামাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিল। তারপর মায়ের উপদেশমত বিপদে স্মরণ করিল চণ্ডীকে। তাহার প্রার্থনায় চণ্ডী সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার ডাকিনী-যোগিনীরা সিংহলরাজের সৈন্যসামন্তদিগকে বিষম প্রহার করিয়া মশান হইতে তাড়াইয়া দিল। রাজা স্বপ্ন দেখিলেন, রাজকন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ দিলে শুভ ফল ফলিবে। তখন তাঁহার মতি-পরিবর্তন হইল। তিনি ধনপতি সদাগরকে মুক্তি দিলেন, আর শ্রীমন্তকে অর্ধেক রাজত্ব সহ রাজকন্যা দান করিলেন। অবশেষে সকলে চণ্ডীর অনুগ্রহে কমলে-কামিনী দেখিয়া ধন্য হইলেন।

ধনপতি সদাগর তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি তাঁহার নষ্ট ডিঙ্গাগুলি ফিরিয়া পাইলেন। এইবার তিনি চণ্ডীর মহিমা বুঝিতে পারিলেন,—বুঝিতে পারিলেন শিবগেহিনী চণ্ডী ও এই মঙ্গলচণ্ডী এক অভিন্ন দেবতা, আদ্যামহাশক্তি। খুব ধূমধাম করিয়া তিনি চণ্ডীর পূজা করিলেন।

মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যের মধ্যে অনেক স্থলেই অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক কাহিনী আছে। প্রাচীন সাহিত্যিকগণের প্রায় সকল রচনাতেই কিছু না কিছু অলৌকিক উপকরণ রহিয়াছে। তবে মুকুন্দরামের কৃতিত্ব বা কবিত্বের পরিচয় এইখানে যে, অলৌকিক চিত্র ও চরিত্র তাঁহার কাব্যে থাকিলেও বাস্তব চিত্র ও চরিত্র অঙ্কনেই তিনি সমধিক পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

মুকুন্দরামের সব চেয়ে বড় পরিচয় তিনি দুঃখের কবি,—তাঁহার কৃতিত্ব দুঃখবর্ণনায়। কালকেতু ও ফুল্লরার ব্যাধজীবনের দারিদ্র্যদুঃখ এবং খুল্লনার দুঃখ অপূর্ব সহানুভূতির সহিত তিনি কাব্যে পরিস্ফুট করিয়াছেন; করুণ রসে অভিষিক্ত হইয়া দুঃখের বাস্তব চিত্র মর্মস্পর্শী হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে যে দারিদ্র্যদুঃখ তিনি সহিয়াছিলেন, তাহাই যেন তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ফুল্লরা-কালকেতু-খুল্লনার অভাব-অনটন যেন রিক্ত কবিরই হাহাকার। তাঁহার কাব্যে যে দুঃখবর্ণনা আছে তাহা যেন সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের দৈনন্দিন দুঃখের কথা।

মুকুন্দরামের কাব্যখানির অপর বিশেষত্ব স্বভাব-বর্ণনায় ও সেকালের ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, গৃহস্থালী প্রভৃতির সরস চিত্রাঙ্কনে। ষোড়শ শতকের বাংলার ধর্ম ও সমাজের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি জানিতে হইলে মুকুন্দ-রামের কাব্য সাগ্রহে পাঠ করিতে হইবে।

মুকুন্দরামের কাব্যখানি চিরকাল বাঙালী জাতির প্রাচীন জীবনের সর্বাঙ্গীণ আলেখ্য রূপে সমাদর পাইবে, দুঃখদারিদ্র্যের এবং আড়ম্বরহীন বাস্তবজীবনের উজ্জ্বলতম চিত্রহিসাবেও কাব্যখানি বঙ্গসাহিত্যে চিরদিন সমাদৃত হইবে।

কাশীরাম দাস

বাঙগালীর জীবনের উপর দুইখানি কাব্য সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—একখানি রামায়ণ, অপরখানি মহাভারত। রামায়ণের মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণখানি সারা বাংলায় ভক্তি ও অনুরাগের সহিত পঠিত হয়, মহাভারতের মধ্যে কাশীরাম দাসের গ্রন্থখানিই সর্বজনপ্রিয় হইয়াছে। বাল্মীকিকৃত সংস্কৃত রামায়ণের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস,—তাঁহার পরে আরও কত কবি বাংলায় রামায়ণকাব্য রচনা করিলেন, কিন্তু বাঙগালীর হৃদয়-সিংহাসনে কৃত্তিবাসী রামায়ণখানির সেই যে একচ্ছত্র আধিপত্য এক সুদূর অতীতে স্থাপিত হইয়াছিল, আজিও তাহা তেমনি রহিয়া গিয়াছে। বাঙগালীর হৃদয়ের উপর কাশীরাম দাসের মহাভারতের আধিপত্যও ঠিক সেইরূপ। কাশীরাম দাস কিন্তু বাংলা ভাষায়

ব্যাসদেবকৃত সংস্কৃত মহাভারতের প্রথম অনুবাদ করেন নাই, তাঁহার পূর্বে অনেক কবি মহাভারতের অথবা মহাভারতোক্ত কোন কোন কাহিনীর বাংলা অনুবাদ করেন। তথাপি কাশীরাম দাসের মহাভারতই বাংলার সর্বত্র পঠিত হইয়া থাকে—অন্য সকল কবির মহাভারত আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কাশীরাম দাসের মহাভারতই বাংলার সর্বত্র নিত্যপাঠ্য আদরের সামগ্রী।

বাঙ্গালীর নিকট আদরণীয় করিয়া তুলিতে হইবে, একথা বিশেষভাবে মনে রাখিয়াই কাশীরাম দাস মূল মহাভারতের কাহিনীকে স্থানে স্থানে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মহাভারতে বাঙ্গালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রভাব যত বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্য কোন অনূদিত মহাভারতে তাহা হয় নাই। কাশীরাম দাসের বর্ণনাভঙ্গিটি অতি সরস, রচনা অতি সরল, বিষয়বস্তুর প্রকাশ অতি স্বচ্ছ। কাশীরাম দাসের জনপ্রিয়তার আর একটি বড় কারণ ছিল,—তাঁহার কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ ও প্রচারই মহাভারতকে এত মধুর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে। যে কারণে বাংলা দেশে রাধাকৃষ্ণের লীলাজ্ঞাপক বৈষ্ণব পদাবলী আদরের সামগ্রী, খানিকটা সেই কারণেই কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙ্গালীর প্রিয় হইয়াছে। এই বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুপুরবেলা কাজ-কর্ম শেষ করিয়া, অথবা রাত্রিকালে দোকানপাট বন্ধ করিয়া দোকানী-পসারীরা প্রদীপের মন্দ স্তিমিত আলোকে নিবিষ্টমনে পড়িতেছে ·

তুমি যদি ছাড় প্রভু আমি না ছাড়িব।
বাজন-নূপুর হয়ে চরণে বাজিব॥

তারপর—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

এই অমৃতসমান মহাভারত-কথা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়া চন্দ্রচূড়-জটাজালে জাহ্নবীধারার মত অবরুদ্ধ ছিল। কঠোর সাধনার দ্বারা ভগীরথ যেমন জাহ্নবীর ধারাকে মর্ত্যে প্রবাহিত করিয়া মর্ত্যবাসীর তৃষ্ণা দূর করিয়া-

ছিলেন, ধরণীকে উর্বরা শস্যশ্যামলা করিয়াছিলেন, কাশীরাম দাসও তদ্রূপ সংস্কৃত ভাষায় মহাভারতের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ ছিল, তাহা বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের গোচর করিয়া বাঙগালীর চিত্তবৃত্তির ও জীবনের সমুন্নতিসাধনের উপায় করিয়া গিয়াছেন। কাশীরাম দাস মহাভারতকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া সাধারণ লোকের যে কিরূপ উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মহাভারত কেবল সংস্কৃতে আবদ্ধ থাকিলে পাণ্ডবদিগের অলৌকিক সৌভ্রাত্র, যুধিষ্ঠিরের অপরিসীম ধর্মনিষ্ঠা, ভীম-অর্জুনের অতুলনীয় বীরত্ব, ভীষ্মের কঠোর প্রতিজ্ঞা ও সত্যনিষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের সার্থক শিক্ষা ও উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ সাধারণ বাঙগালী পাঠক-পাঠিকার অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

কাশীরাম দাস মহাভারত-রচনাকালে ব্যাসদেবের সংস্কৃত মহাভারতকে যেমন অনুসরণ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের অনূদিত মহাভারত কাব্য ও ভারতোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান ও পর্ববিশেষের অনুবাদ হইতেও অনেক সাহায্য লইয়াছিলেন। তথাপি কাশীরামের মৌলিকতা অনস্বীকার্য। তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলেই কবির নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি, ছন্দ ও শব্দবিন্যাস এবং অলঙ্কার-প্রয়োগের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেমন বাল্মীকি-রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নহে, কাশীরাম দাসের মহাভারতও তেমনি ব্যাসদেবের মহাভারতের অবিকল অনুগামী নহে। সে-যুগের অনুবাদকগণ কোন কাব্য অনুবাদ করিতে গিয়া ঠিক প্রতি কথার অর্থ বসাইয়া যান নাই। অনেক জায়গায় তাঁহারা বাড়াইয়াছেন, অনেক জায়গায় কমাইয়াছেন। ফলে, তাঁহাদের কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির পরিচয়ও তাঁহাদের অনুবাদ-গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। কাশীরাম দাসের মহাভারত সেই-রূপ অনুবাদগ্রন্থ; ইহাতে কবির স্বকীয় কল্পনা ও কবিত্বের পরিচয় আছে। তাঁহার অনুবাদ অনেক স্থলে নূতন সৃষ্টিও বটে। কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ করিতে গিয়া অনেক কিছু সংস্কৃত মহাভারত হইতে লইয়াছেন, কিছু সংস্কৃত পুরাণ হইতেও লইয়াছেন,—আবার কিছু তাঁহার পূর্বগামী কবিগণের মহাভারত হইতে এবং কথকঠাকুরগণের বিবরণ হইতে লইয়াছেন। সেই আহৃত

অংশগুলি তিনি নিজস্ব ভাষার মাধুর্যে, অলঙ্কারের ঐশ্বর্যে ও বর্ণনার নৈপুণ্যে নূতন ভাবে সাজাইয়াছেন। এইজন্য তাঁহার অনুবাদের মাধুর্য বাঙ্গালীকে এত আকৃষ্ট করিয়াছে। কবির নিজস্ব কবিত্বের অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাব ও কল্পনার ছোঁয়াচ না লাগিলে সংস্কৃত হইতে অনূদিত মহাভারত এত জনপ্রিয় হইত কি না সন্দেহ।

কাশীরামের পূর্বগামী যে সকল মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, উহাদের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন মহাভারত উহার অংশ-বিশেষে কাশীরাম দাসের মহাভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তথাপি কাশীরাম দাসের মহাভারত যে বাংলাদেশে একচ্ছত্র আসন লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে কাশীরাম দাসের মহাভারতখানি বঙ্গসাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের রচিত মহাভারতের মধ্যে খণ্ড সৌন্দর্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারতে আদ্যোপান্ত সৌন্দর্যস্রোত সমানভাবে প্রবাহিত হইয়া কাব্যখানির মাধুর্য অব্যাহত রাখিয়াছে এবং ইহাকে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অখণ্ড সৃষ্টির সমগ্র রূপ দান করিয়াছে।

কাশীরাম দাসের জীবনী-সম্বন্ধে যৎসামান্যই জানা গিয়াছে। প্রাচীন-কালের কবিগণ কবিযশঃপ্রার্থীই ছিলেন—কাব্যের মধ্যেই তাঁহারা নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় রাখিয়া যাইতেন। ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার লোক-সমাজে প্রচার করাটা তাঁহারা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন না। তাই প্রাচীন বাংলার কবিদিগের জীবনী-সম্বন্ধে বেশী কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই।

কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারতে আত্মপরিচয়-প্রদানের স্থলে শুধু এইটুকুই বলিয়াছেন :

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপরস্থিতি।
দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ-কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস-পুত্র সুধাকর নাম॥

তৎপুত্র কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রকাশি' কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥

এই বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, বর্ধমান জেলার উত্তরদিকে ইন্দ্রাণী নামে এক পরগণা ছিল। বর্তমান কাটোয়া ঐ পরগণার অন্তর্গত। সেখানে ব্রহ্মাণী নদীর তীরবর্তী সিঙ্গি নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে কাশীরাম দাসের নিবাস ছিল। তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর, পিতার নাম কমলাকান্ত। কমলাকান্তের তিন পুত্র ছিল,—অর্থাৎ কাশীরাম দাসেরা তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস, মধ্যম কাশীরাম, কনিষ্ঠ গদাধর। তাঁহারা তিন ভ্রাতাই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কাশীরাম সপ্তদশ শতকের শেষপাদ হইতে অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কাশীরাম জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার কৌলিক উপাধি ছিল 'দেব'। কবিপ্রতিভা ইঁহার অপর দুই ভ্রাতারও ছিল। তাঁহারাও কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশীরামের মত খ্যাতি তাঁহারা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কাশীরাম দাস মহাভারত ভিন্ন "স্বপ্নপর্ব", "জলপর্ব" ও "নলোপাখ্যান" নামে আরও তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেগুলিতে কবি-প্রতিভার তেমন বিকাশ দেখা যায় না। তাঁহার যশ মহাভারতকে আশ্রয় করিয়াই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

কথিত আছে যে, কাশীরাম দাস মেদিনীপুরের আওসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া শিক্ষকতা করিতেন। এই রাজবাড়ীতে সমাগত পুরাণপাঠকারী পণ্ডিত ও কথকদিগের মুখে পুরাণ ও মহাভারত-প্রসঙ্গ শুনিয়া নাকি কাশীরাম দাসের মহাভারত-রচনার ইচ্ছা জন্মে। একটা প্রবাদ আছে,—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

এই প্রবাদটির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারতের বিরাট পর্ব পর্যন্ত রচনা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত

হ'ন; বিরাট পর্বের পরবর্তী অধ্যায়গুলি অন্য কোন কবির রচনা—সেগুলি কালক্রমে কাশীদাসী মহাভারতের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটি মাত্র প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। কবি শুধু বিরাট পর্ব পর্যন্ত নহে, সমগ্র মহাভারতখানিই রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

কাশীরাম দাসের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা কাব্যের ভাষায় ও বর্ণনা-ভঙ্গিতে বেশ একটা স্বাভাবিকতা ছিল। সে যুগের কবিরা সহজ মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া তাঁহাদের ভাব প্রকাশ করিতেন। মুকুন্দরামের রচনায় আমরা এইরূপ প্রাণের কথা সহজ অনাড়ম্বর ভাবে প্রকাশ পাইতে দেখি। কিন্তু কাশীরাম দাসের পরবর্তী কালে বাংলা কবিতার সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। তখন অলংকারের ঘটায়, শব্দের ছটায়, নানারূপ আড়ম্বরের আতিশয্যে বাংলা কবিতার সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য ঢাকা পড়িয়াছিল। কাশীরাম দাস এই দুই যুগের মধ্যবর্তী কবি। তাই তাঁহার রচনায় একদিকে যেমন মুকুন্দরাম প্রভৃতির স্বাভাবিকতা আছে, তেমনি আবার পরবর্তী যুগের মার্জিত ভাষা এবং সুন্দর অনুপ্রাস-উপমা প্রভৃতির প্রয়োগ আছে। এক কথায়,—কাশীরাম দাসে তাঁহার পূর্ববর্তী যুগের নিরলংকার স্বভাবসৌন্দর্যের ও পরবর্তী ভারতচন্দ্রীয় যুগের অলংকারের ঐশ্বর্যদীপ্ত সৌন্দর্যের এক অপরূপ সমন্বয়-সাধন হইয়াছে। একদিকে অতীত যুগের তিনি ধারক ও বাহক, অপরদিকে পরবর্তী যুগের আভাসটুকুও তাঁহার মধ্যে অভিব্যক্ত। লক্ষ্যভেদ করিতে প্রস্তুত অর্জুনের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যখন বলিতেছেন—

দেখ দ্বিজ মনসিজ, জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম, নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি, করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব, অধর রাতুল।
খগরাজ পায় লাজ, নাসিকা অতুল॥

দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর।
গজস্কন্ধ গতি মন্দ মত্ত করিকর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে, আজানুলম্বিত।
করিকর যুগ্মবর, জানু সুবলিত॥
বুকপাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে, ধৈর্য ধরে কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য যেন সূর্য ঢাকিয়াছে মেঘে।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিত লাগে॥

তখন আমরা কবির অনুপ্রাস-রচনার ও উপমা প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্যেরই পরিচয় পাই। এখানে কথার পর কথা সাজাইয়া একটা চমক লাগাইবার চেষ্টা আছে। অবশ্য স্বাভাবিক বর্ণনাও কাশীদাসী মহাভারতে অনেক আছে। স্বাভাবিক বর্ণনার দ্বারা তিনি জনসাধারণের অন্তর স্পর্শ করিয়াছেন, আর অনুপ্রাস-উপমাদি-বহুল রচনার দ্বারা তিনি পণ্ডিতগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতে, ভাষাকে শ্রুতিসুখকর করিতে ও ভাবকে অতি অল্পায়াসে পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ব্যাসদেব নিজেই মহাভারত কাব্যখানিকে মহাসমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এ তুলনা যথার্থ তুলনা। মহাসমুদ্র যেমন রত্নাকর, মহাভারতও তেমনি রত্নাকর। মহাসমুদ্র হইতে ডুবুরি যেমন মণিমুক্তা আহরণ করিয়া আনে, তেমনি মহাভরত হইতেও কত কবি যে তাঁহাদের কাব্যরচনার, কত নাট্যকার যে তাঁহাদের নাট্যরচনার উপকরণ পাইয়াছেন, কত বীর যে তাঁহাদের বীরত্বের অনুপ্রেরণা, কত মানুষ যে সত্যনিষ্ঠার, ধর্মপরায়ণতার, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতির আদর্শ লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। মহাসমুদ্রের মত মহাভারত-কাব্য বিশাল, মহাসমুদ্রের মতই উহার ঐশ্বর্য অতুলনীয় ও অফুরন্ত।

মহাভারতের সহিত আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী গিরিরাজ হিমালয়ের সার্থক তুলনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ভৌগোলিক দিক দিয়া হিমালয়ের যেমন গুরুত্ব, ভাবের দিক দিয়া মহাভারতেরও সেইরূপ গুরুত্ব। তাই লোকে বলে—যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে; অর্থাৎ, মহাভারতে নাই এমন কোন বস্তু

ভারতবর্ষে নাই। উহারই কথা-কাহিনী-নীতি-উপদেশ ভারতবর্ষে লোকশিক্ষার প্রধান সম্বল। হিমাচল যেরূপ তাহার সুবিশাল পাষাণদেহ প্রসারিত করিয়া উন্নত মস্তকে ভারতভূমিকে যুগযুগান্তকাল ধরিয়া নানারূপ দুর্যোগ হইতে রক্ষা করিতেছে, মহাভারত-কাব্যগ্রন্থখানিও সেইরূপ সমগ্র আর্যজাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক এবং পোষক রূপে বিরাজ করিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তকে আড়াল করিয়া গিরিরাজ হিমালয় তাহার পাষাণদেহ বিস্তৃত করিয়া না রাখিলে এই ভারতবর্ষ এক বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হইত, এখানে তৃষ্ণার জল অথবা ফুলফল শস্যসম্ভার কিছুই পাওয়া যাইত না। তেমনি মহাভারত-কাব্যখানি এই ভারতে না থাকিলে মানুষের চিত্ত সুস্থ সুকুমার অথবা বলিষ্ঠ ভাবধারার অভাবে শুকাইয়া যাইত। হিমালয় হইতে অসংখ্য নদীজলধারা উৎপন্ন হইয়া সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে; তাহাতেই ধনে ধান্যে শস্যসম্ভারে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মহাভারত হইতেও সেইরূপ অসংখ্য ভাবধারা প্রবাহিত হইয়া ভারতের নরনারীর ভাবজীবনকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহাদের আত্মার ক্ষুধা মিটাইয়াছে—তাহাদের জীবন গড়িয়াছে। কত গল্প, কত কাহিনী, কত নীতি-কথা সহস্রভাবে সহস্র খাতে প্রবাহিত হইয়া ভারতের সাহিত্যকে চিরশ্যাম করিয়া রাখিয়াছে এবং জাতীয় জীবনে তাহা আবহমানকাল লক্ষ্মীশ্রী ফুটাইয়া রাখিয়াছে। মহাভারত তাই ভারতের সাহিত্যের, তথা জীবনের প্রধান আশ্রয়। বিশালতায় ও রসধারার অজস্র পরিবেষণে উহা হিমালয়েরই সদৃশ। কাশীরাম দাস সেই হিমালয়-সদৃশ মহাকাব্যকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের—তথা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের যে উন্নতি ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরকাল বাঙ্গালীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া থাকিবেন।

ভারতচন্দ্র রায়

হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুরের মুন্সীবাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা হইবে। ব্রতকথার পুঁথি পড়িবার ভার দেওয়া হইল পনের বছরের এক কিশোর ব্রাহ্মণকে। তিনি গোপনে নিজেই এক পাঁচালী রচনা করিয়া সেই দিন পাঠ করিলেন এবং ভণিতা করিবার কালে নিজের নামটা উহার সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া সকল শ্রোতাকে জানাইয়া দিলেন যে সত্যনারায়ণের সেই পাঁচালীর রচয়িতা পাঠক নিজেই। ইহাতে অল্পবয়স্ক এই কিশোরের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া সকল শ্রোতা আনন্দিত হইলেন। আর এক দিনও সত্যনারায়ণের পূজার পর এই কিশোর ব্রাহ্মণই অন্য একটি নূতন ব্রতকথা রচনা করিয়া পাঠ করিলেন এবং রচনাশক্তিতে নিজের নিপুণতার পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া

দিলেন। উত্তরকালে একদিন এই কিশোর বালকের কবিত্বের প্রভায় বাংলা সাহিত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই কিশোর ব্রাহ্মণটির নাম ভারতচন্দ্র রায়। অতি অল্পবয়সে ইঁহার কবিত্বস্ফুরণ হইয়াছিল। পরিণত প্রতিভার সৃষ্টিতে অসাধারণ শব্দ-বিন্যাসের কৌশল ও ছন্দরচনার শক্তির পরিচয় দিয়া তিনি তাঁহার নাম বঙ্গ-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

হাবড়া আমতার নিকটে পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। এই স্থানের জমিদার ছিলেন রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ভারতচন্দ্র এই নরেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের পুত্র।

ভারতচন্দ্রের শুধু কবিপ্রতিভাই ছিল না, তিনি নানা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কোন্ কোন্ বিষয়ে তিনি পণ্ডিত ছিলেন তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি নিজেই তাঁহার পুস্তকে দিয়া গিয়াছেন—

ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, নাটক।
অলঙ্কার, সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগম বেত্তা, নাগরী, পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরসী॥

অর্থাৎ ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার, সঙ্গীতশাস্ত্র, পুরাণ ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্র তিনি বেশ ভাল করিয়াই শিখিয়াছিলেন এবং ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষাদানেও তিনি ছিলেন পটু। তাহা ছাড়া তিনি যে শুধু বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষাই জানিতেন এমন নহে, নাগরী বা হিন্দী এবং ফারসী ভাষাও তিনি ভালরূপ জানিতেন। ভারতচন্দ্র যে বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার রচনার মধ্যেও রহিয়াছে।

ভারতচন্দ্র স্বয়ং জমিদারের ছেলে এবং পণ্ডিত হইলে হইবে কি, জীবনে তাঁহাকে অনেকবার অনেক দুঃখ-কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। একবার তাঁহার পিতার সহিত বর্ধমানের রাণীর বিবাদ হয়। উহার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং জীবনস্রোতে তাঁহাকে এখানে ওখানে বেশ

কিছুদিন ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। অবশেষে কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করিয়া তিনি বিপন্মুক্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও গুণীর আদর করিতেন। তাঁহার রাজসভায় স্মার্ত, নৈয়ায়িক, দার্শনিক- অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবির সে সভায় একান্ত অভাব ছিল। তাই বিপন্ন আশ্রয়হীন ভারতচন্দ্রকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরম সমাদরের সহিত তাঁহার সভাকবি হিসাবে বরণ করিলেন। রাজসরকার হইতে মাসিক বৃত্তি পাইয়া, রাজার আশ্রয় লাভ করিয়া ভারতচন্দ্রের অবস্থা ভাল হইল। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে একখানি কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কাব্যখানির নাম "কালিকামঙ্গল"।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ছিলেন। তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য কবি "কালিকামঙ্গল" কাব্যখানি রচনা করিলেন। ইহাতে কালিকা-মাহাত্ম্য কীর্তিত হইল। পরে যখন কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার অমর কাব্য "অন্নদামঙ্গল" রচনা করেন, তখন এই "কালিকামঙ্গল"খানি কাটিয়া-ছাঁটিয়া, মাজিয়া-ঘষিয়া, পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া "অন্নদামঙ্গলে"র মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন।

"কালিকামঙ্গল" ও "অন্নদামঙ্গল" এই কাব্য দুইখানি শ্রবণ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিত্বে এত চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'কবিকঙ্কণ' বলিতে যেমন "চণ্ডীমঙ্গলে"র কবি মুকুন্দরামকে বুঝায়, 'রায়গুণাকর' বলিলে তেমনি "অন্নদামঙ্গলে"র কবি ভারতচন্দ্রকে বুঝায়।

"অন্নদামঙ্গল" রায়গুণাকরের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদা-মঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" বাস্তবিক ছন্দের বৈচিত্র্যে ও শব্দের ঐশ্বর্যে ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্য রত্নমালার মতই উজ্জ্বল। ইহার আদ্যোপান্ত মাজা-ঘষা পরিষ্কার-করা। পংক্তিগুলি যেন সমস্থুল মুক্তামালা। মুকুন্দরামের কাব্যে দারিদ্র্যের সুর—সে সুর বড় করুণ, বড় মর্মন্তুদ। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে

বিলাস-কলার ছটা। মুকুন্দরামের কবিতায় দারিদ্র্যের দীর্ঘশ্বাস, ভারতচন্দ্রের কবিতায় ঐশ্বর্যের নব নব বিলাস!

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি যে ধরণের মঙ্গলকাব্য প্রচলিত ছিল, ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল"ও দেখিতে সেই ধরণের কাব্য। ইহাতে দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গ-ক্রমে কবি তাঁহার আশ্রয়দাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন পুরুষদিগের যশোগানও সারিয়া লইয়াছেন।

"অন্নদামঙ্গল" কাব্যখানি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যের মত দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, ব্যাসের কাশীনির্মাণ ইত্যাদি পুরাণান্তর্গত অনেক বিষয় ও কাহিনীর বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে "বিদ্যাসুন্দর"। যে কাব্যখানি রচনার জন্য ভাবতচন্দ্রের সুযশ বা কুযশ সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান "অন্নদামঙ্গল" কাব্যেরই একটা অংশ মাত্র। এককালে ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রা প্রভৃতিতেও গীত হইত। "বিদ্যাসুন্দরে"র উপাখ্যানভাগে চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা কবির পাণ্ডিত্যের প্রভা, যমক-শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারেব ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশী। সংস্কৃত কাব্যে ব্যবহৃত অনেক রকমেব ছন্দ কবি এখানে আমদানী কবিয়াছেন।

"অন্নদামঙ্গলে"র তৃতীয় ভাগের নাম "মানসিংহ"। এই অংশে মানসিংহের যশোহর-বিজয় ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের কীর্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচীন রীতি-অনুসারে ভারতচন্দ্র গণেশ, শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীগণের বন্দনা করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। অতঃপর ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যরচনার একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। দেবদেবীর বন্দনা করার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ একটা কৈফিয়ৎ দিয়া কাব্য রচনা করা প্রাচীন কবিদিগের একটি সাধারণ রীতি ছিল। মুকুন্দরাম প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাগণের ন্যায় ভারতচন্দ্রও স্বপ্নাদেশে তাঁহার "অন্নদামঙ্গল"-কাব্য রচনা

করিয়াছেন। দেবী অন্নপূর্ণা মাতৃবেশে নিদ্রিত ভারতচন্দ্রের শিয়রে বসিয়া তাঁহাকে "অন্নদামঙ্গল"-কাব্য রচনা করিতে আদেশ দান করেন—

স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে॥

দেবীর নিকট হইতে এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইবার একটি কারণও ছিল—কবি তাহা বলিয়াছেন। কারণটি এইঃ

বাংলাদেশে তখন বর্গীর হাঙ্গামা চলিতেছিল। বর্গীরা আসিয়া সমস্ত দেশ এমনভাবে লুঠিয়া লইয়াছিল যে নবাবকে খাজনা দিবার সামর্থ্য জমিদারের ছিল না, আর প্রজারও জমিদারকে খাজনা দিবার সামর্থ্য ছিল না। ছেলেবেলার ঘুমপাড়ানী ছড়ায় আমরা এই কথা কত শুনিয়াছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই দুর্বিপাকের মধ্যে পড়িয়াছিলেন এবং বারো লাখ টাকা খাজনা দিতে না পারিয়া মুর্শিদাবাদে আটক হইয়াছিলেন। এই কষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র দেবীপূজা করিলেন। তখন—

অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
** ** **
চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি-ব্যবস্থায়॥
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥
আমি তারে স্বপ্নে কব তার মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতের সার্থকতা সবিশেষে॥

দেবীর এই নির্দেশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আশ্বস্ত হইলেন। মুক্তি পাইয়া তিনি ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং তাঁহাকে অন্নপূর্ণার মহিমা কীর্তন করিয়া অন্নদামঙ্গল গান রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। এইভাবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও কবি ভারতচন্দ্র এই দুইজনের প্রতি স্বপ্নাদেশের ফলে "অন্নদামঙ্গল"-কাব্যখানি রচিত হইল। বস্তুতঃ বিপন্ন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ও তাঁহার রাজ্যের মঙ্গল-সাধনের উদ্দেশ্যেই ভারতচন্দ্রের কাব্যখানি রচিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বপ্নাদেশ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। উহা সে যুগের লেখকদিগের একটা প্রচলিত কৈফিয়ৎ।

গ্রন্থ-সূচনায় এই স্বপ্নের কথা বলিয়া লইয়া কবি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা করিয়াছেন। সভাবর্ণনার প্রারম্ভেই ভারতচন্দ্রের কথার চাতুরী বেশ বুঝা যায়। শ্লেষে এবং রসিকতায় ভারতচন্দ্রের জুড়ি মেলা ভার। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি সেই শ্লেষ ও রসিকতার একশেষ করিয়াছেন। আকাশের শুভ্র চন্দ্রের সহিত ভূতলের কৃষ্ণচন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি আকাশের চন্দ্রকে ম্লান করিয়াছেন। ভাষার কারুকার্য ও এখানে অতুলনীয়।

চন্দ্র সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জোৎস্নাময়॥

সভাবর্ণনার পর দক্ষের যজ্ঞ-কথা। শিবজায়া সতী দক্ষের কন্যা। দক্ষ যজ্ঞ করিতেছেন, যজ্ঞের ভাগ দেবতারা আসিয়া গ্রহণ করিবেন—তাঁহারা সকলেই সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত। কিন্তু জামাতা শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই—অথচ তিনি 'মহাদেব', 'দেবাদিদেব', তাঁহার নিমন্ত্রণ হওয়া উচিত ছিল। দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ না করিয়া শিবহীন যজ্ঞ করাই স্থির করিয়াছিলেন।

পিতা যজ্ঞ করিতেছেন, সতীর সাধ হইল তাহা দেখিতে যাইবেন। মহাদেব ইহাতে প্রথমটায় আপত্তি তুলিলেন। তিনি বলিলেন, বিনা নিমন্ত্রণে যজ্ঞস্থলে গিয়া অপমানিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সতী বলিলেন, কন্যা পিত্রালয়ে যাইবে, তাহার আবার নিমন্ত্রণ কি? মহাদেব তথাপি অনুমতি দিলেন না। তখন সতী দশমহাবিদ্যা-মূর্তি ধরিয়া মায়াপ্রভাবে মহাদেবকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক কষ্টে মহাদেবের অনুমতি পাওয়া গেল। সতী পিত্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি শুনিলেন, দক্ষ শিবনিন্দা করিতেছেন। পিতার মুখে পতিনিন্দা সহিতে না পারিয়া সতী পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত দেহ যোগবলে ত্যাগ করিলেন। দক্ষমুখে শিব-নিন্দাচ্ছলে কবি প্রকৃতপক্ষে ভাষার চাতুর্যে শিবের স্তুতি করিয়া লইয়াছেন। অলংকার শাস্ত্রে ইহার নাম 'ব্যাজস্তুতি'।

যাহা হউক, শিবের কানে যখন সতীর দেহত্যাগের সংবাদ গিয়া পৌঁছিল, তখন তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন। তিনি তাঁহার ভৈরব ভৈরবী, নন্দী ভৃঙ্গী, ভূত প্রেতের দল লইয়া দক্ষের যজ্ঞস্থলে গিয়া পৌঁছিলেন। তাহাদের ভৈরব নৃত্যে, কোলাহলে ও হুংকারে দক্ষের যজ্ঞভূমি এক পৈশাচিক শ্মশান-দৃশ্যে পরিণত হইয়া গেল। শিবের অনুচর ভূতপ্রেতেরা যজ্ঞ নষ্ট করিয়া ফেলিল। কত মুনি ঋষি আসিয়াছিলেন যজ্ঞ করিতে বা করাইতে। কাহারও দাঁত ভাঙিল, কাহারও দাড়ি ছিঁড়িল। সে এক প্রলয় কান্ড। দক্ষের মাথা শিবের অনুচরেরা কাটিয়া ফেলিল।

তখন শিবের শাশুড়ী দক্ষের স্ত্রী প্রসূতি শিবকে বলিয়া-কহিয়া স্বামীকে বাঁচাইলেন। কিন্তু গোলমালের মধ্যে দক্ষের মুন্ডটা যে কোথায় গিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অগত্যা একটা ছাগলের মাথা কাটিয়া তাঁহার ধড়ে জোড়া দেওয়া হইল। নরমুন্ডের পরিবর্তে দক্ষ ছাগ-মুন্ডধারী হইয়া বাঁচিলেন।

ওদিকে সতীর প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে লইয়া শিব অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শোকোন্মত্ত মহাদেবকে আর কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় না। ব্যাপার দেখিয়া বিষ্ণু চক্র নিক্ষেপ করিয়া সতীদেহ খান খান করিয়া

কাটিয়া ফেলিলেন। সতীদেহ একান্ন টুকরা হইয়া একান্নটি স্থানে পড়িল। যেখানে যেখানে সতীর অঙ্গ পড়িল, সেই সেই স্থানই এক একটি মহাপীঠস্থানে পরিণত হইল। সেগুলি হিন্দুর পরমতীর্থ বলিয়া আজিও পরিগণিত। কলিকাতাস্থিত কালীঘাটও এই একান্ন পীঠের একটি, কারণ এখানে দেবীর দক্ষিণ পদের চারি অঙ্গুলি পড়িয়াছিল।

সতীকে হারাইয়া শিব এইবার হিমালয়ে ধ্যান করিতে বসিলেন। তিনি নিঃসাড় নিস্পন্দ,—সতীকে হারাইয়া তিনি শক্তিহীন। কিন্তু শিব শক্তিহীন হইলে সৃষ্টি চলিবে কি করিয়া? তাই বিষ্ণু নারদকে ঘটক করিয়া হিমালয়ে পাঠাইলেন, তিনি শিবের আবার বিবাহ দিবেন। ইতিমধ্যে দেহত্যাগের পর সতী হিমালয়ের ঘরে মেনকার গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

নারদ হিমালয়ে গিয়া কন্যা উমার সহিত শিবের বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিয়া ফেলিলেন—উমার মাতা মেনকা রাজি হইলেন। তখন নারদের পরামর্শে শিবের ধ্যানভঙ্গ হইল। মন্মথদেব পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করিয়া শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। শিব চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার ললাটস্থিত তৃতীয় নেত্রের বহ্নিজ্বালায় মন্মথকে দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিলেন। তখন মন্মথের স্ত্রী রতি কাঁদিয়া অস্থির। তাঁহার করুণ ক্রন্দনে আকাশবাণী হইল--দ্বারকায় মন্মথ পুনর্জন্ম লাভ করিবেন। আশ্বস্ত হইয়া রতি দ্বারকায় গেলেন।

এইবার শিবের বিবাহের ধুম পড়িয়া গেল। নাচ-গানে তাঁহার সঙ্গীরা অস্থির -

ভভম্ ভভম্ ববম্ ভাল।
ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল॥
রুদ্র তালে তাল দেয় বেতাল,
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া॥

উমার সহিত শিবের বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু শিবের রুদ্র মূর্তি আর তাঁহার অদ্ভুত সঙ্গীদিগকে দেখিয়া মেনকা কাঁদিয়া অস্থির! তখন শিব তাঁহাকে তাঁহার শান্ত সৌম্য মূর্তি দেখাইলেন—পরণে দিব্য বস্ত্র, গায়ে দিব্য পৈতা, দিব্য চন্দন,—মাথায় মুকুট, মুখে কোটি চাঁদের শোভা।

শিব উমাকে কৈলাসে লইয়া গেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই হর-গৌরীর কোন্দল বাধিল। কারণ, ঘরে কিছু নাই, অথচ শিব ঘরের ভাবনা ভাবেন না। ইহাতে রুষ্টা হইয়া ভবানী শিবকে কয়টা কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন। শিব রাগিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন। গৌরী অভিমানে বাপের বাড়ী যাইবেন। এমন সময়ে গৌরীর সখী জয়া আসিয়া বলিলেন, "কেন এমন ছেলে-খেলা কর! ত্রিভুবনের অন্ন হরণ করিয়া আন, শিব তখন আর কোথাও ভিক্ষার অন্ন পাইবেন না, তোমার কাছেই শেষ পর্যন্ত তাহা হইলে তাঁহাকে আসিতে হইবে। তুমি অন্নপূর্ণা মূর্তি ধরিয়া লোকের সব দুঃখকষ্ট দূর কর।" জয়ার এই পরামর্শ গৌরীর মনে ধরিল। তাঁহার মায়ায় ত্রিভুবন লক্ষ্মীহারা হইল।

ওদিকে শিব কোথাও ভিক্ষার অন্ন না পাইয়া বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর কাছে গেলেন। কিন্তু মহামায়ার মায়ায় লক্ষ্মীও যে লক্ষ্মীছাড়া! শিবের আর কষ্টের অবধি রহিল না। কিন্তু লক্ষ্মীর কথায় তিনি কৈলাসে ফিরিলেন। সেখানে অন্নপূর্ণা শিবকে অন্নদান করিলেন। মহাদেব পঞ্চমুখে মহানন্দে ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলেন। খাইয়া-দাইয়া শিব এত খুশী যে তিনি নাচিতে সুরু করিলেন—

লট পট জটা লপটে পায়।
ঝর্ ঝর্ ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর্ গর্ গর্ গরজে ফণী।
দপ্ দপ্ দপ্ দীপয়ে মণি॥
ধক্ ধক্ ধক্ ভালে অনল।
তর্ তর্ তর্ চাঁদ মণ্ডল॥
সর্ সর্ সরে বাঘের ছাল।
দল-মল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজায়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
ববম্ ববম্ বাজায়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥

খুশী হইয়া শিব কাশীতে অন্নপূর্ণার জন্য স্বর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়া পুরী নির্মাণ করাইলেন। অন্নপূর্ণার পূজা দেবলোকে প্রচলিত হইল।

কিন্তু অন্নপূর্ণার পূজা শুধু ত দেবলোকে প্রচলিত হইলে চলিবে না। তাঁহার পূজা যে পৃথিবীতেও প্রচলিত হওয়া দরকার। এইজন্য তিনি প্রথমে হরি হোড় নামে এক দুঃখীর ঘরে গিয়া তাহার দুঃখ আর অভাব অনটন দূর করিলেন।

হরি হোড় শাপভ্রষ্ট দেবতা। অন্নপূর্ণার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করায় পৃথিবীতে তাহার জন্ম হইয়াছিল এক দুঃখিনীর ঘরে। সে ছিল কুবেরের অনুচর—তখন তাহার নাম ছিল বসুন্ধর। কুবের একদিন বসুন্ধরকে অন্নপূর্ণার পূজার জন্য ফুল তুলিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ফুল তুলিতে গিয়া সে ফুল দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল—অন্নপূর্ণাপূজার ফুল তুলিবার কথা সে একেবারে ভুলিয়া গেল। এই পাপে দেবী তাহাকে শাপ দিলেন, "তুমি পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।" দেবীর শাপ ব্যর্থ হইবার নয়—বসুন্ধর হরি হোড় রূপে এক দুঃখিনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিল।

কাঠ কুড়াইয়া তাহার দিন চলে,—হঠাৎ একদিন জঙ্গলের মধ্যে এক বুড়ির সঙ্গে তাহার দেখা হইল। তাহার কাছে ঝুড়ি-ভরা ঘুঁটে, একবোঝা কাঠ। অথচ হরি নিজে সেদিন বনে একটিও কাঠ পায় নাই। হরিকে দেখিয়া বুড়ি বলিল, "বাছা, আমার এই ঘুঁটে ও কাঠের বোঝাটা একটু বহিয়া দাও, আমি তোমায় অর্ধেক দিব।"

পথে যাইতে হরির বাড়ী পড়িল—তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বুড়ি আর চলিতে চাহিল না, সে হরির বাড়ীতে অতিথি হইতে চাহিল। কিন্তু হরি ও হরির মা উভয়ে আপত্তি করিল। তাহাদের "ভাঙা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে", তাহাতে আবার ঘরে ভাত নাই। তাহারা বুড়িকে কোথায় রাখিবে, কি খাওয়াইবে?

তখন বুড়ি বলিল, "তোমরা অত অভাবে কষ্ট পাও কেন? অন্নপূর্ণার নাম কর, তিনি তোমাদের অন্ন দিবেন।"

বুড়ির কথায় আশ্বস্ত হইয়া হরি ও হরির মা দেবীর নাম করিল। ফলে দেখা গেল—সত্যই ত হাঁড়ির মধ্যে অন্নব্যঞ্জন রহিয়াছে! তারপর বুড়ি এক-খানি ঘুঁটে চাহিল। হরি তাহাকে একখানি ঘুঁটে দিল, বুড়ি তাহা ছুঁইতেই উহা সোনা হইয়া গেল। তখন বুড়ি অন্নপূর্ণার মূর্তি ধরিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে দরিদ্র হরি হোড়ের সব অভাব দূর হইয়া গেল ঐশ্বর্যে ধন-রত্নে তাহার ঘর ভরিয়া গেল।

হরি হোড়ের গৃহ হইতে অন্নপূর্ণা গেলেন ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে, কারণ পৃথিবীর নানা জায়গায় তাঁহার পূজা প্রবর্তন করিতে হইবে। এই ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণনগরের মহারাজ ও কবি ভারতচন্দ্রের আশ্রয়দাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ।

ভবানন্দের বাড়ী যাইতে পথে একটি নদী পড়িল। নদীটি পার না হইলে অন্নপূর্ণা ভবানন্দের বাড়ী যান কিরূপে? সুতরাং তিনি সেই নদীর খেয়ার পাটনীকে অনুরোধ করিলেন, "আমায় খেয়া পার করিয়া দাও।" ঈশ্বরী পাটনী সেই ঘাটে খেয়া পারাপার করিত। যুবতী কুলবধূবেশে উপস্থিতা অন্নপূর্ণার পরিচয় না পাইলে সে কিছুতেই তাঁহাকে খেয়া পার করিতে রাজী হইল না। অন্নপূর্ণা তখন এমন ভাবে তাঁহার পরিচয় দিলেন যাহার দুই অর্থ হয়।

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই॥

দেবীর মুখ হইতে তাঁহার পরিচয় শুনিয়া পাটনী ভাবিল, তিনি বুঝি বা কুলীনের ঘরের বউ, তাই তাঁহার বড় কষ্ট, আর সেই কষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তিনি পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছেন। মূর্খ পাটনী না বুঝিলেও এই দ্ব্যর্থক বাক্যাবলীর মধ্য দিয়া দেবী তাঁহার সত্যকার পরিচয়ই দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, পরিচয় পাইয়া পাটনী তাঁহাকে পার করিয়া দিতে স্বীকৃত হইল। তখন দেবী নৌকায় বসিয়া পা ঝুলাইয়া জলের উপর রাখিলেন। দেবীর আলতা-পরা রাঙা পা দু'খানি নদীর উপর লাল পদ্মের মত শোভা পাইল।

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥

তখন দেবীতে ও পাটনীতে কথোপকথন হইল –

পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙা চরণ॥
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥
*　　*　　*　　*
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥

ব্যাপার দেখিয়া পাটনী বুঝিল, "এ ত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়!" তখন সে দেবীকে বলিল, "স্পষ্ট করিয়া বল, তুমি কে? কোন্ দেবী আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আজ আমার নায়ে আসিয়াছ?"

অন্নপূর্ণা এইবার কোনরূপ হেঁয়ালি না করিয়া স্পষ্টই বলিলেন—

আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে॥

এই কথা বলিয়া দেবী ঈশ্বরী পাটনীকে বর দিতে চাহিলেন। পাটনী বর চাহিল—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" দেখিতে না দেখিতে দেবী অদৃশ্য হইয়া গেলেন, পাটনী তাঁহার আর সন্ধান পাইল না। পাটনী দেবীর মুখেই শুনিয়াছিল যে তিনি ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে যাইবার জন্য রওনা হইয়াছেন। সুতরাং সে গিয়া ভবানন্দ মজুমদারকে সব কথা বলিল, তাঁহাকে সোনার সেঁউতিও দেখাইল। ভবানন্দ মজুমদার তৎক্ষণাৎ দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন—ঘরের মেঝেতে একটি সুন্দর ঝাঁপি পড়িয়া আছে, চারিদিক হইতে ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাইতেছে, কানে সুমধুর বেণুবীণানিক্কণ আর নাচ-গানের মধুর শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। কে যেন তাঁহাকে বলিল, "ইহা অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কখনও ইহা খুলিও না। তোমার বংশে অন্নপূর্ণার দয়া।" দেবীর প্রসাদে ভবানন্দ মজুমদারের সুখ-সমৃদ্ধি, ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

ওদিকে বাংলাদেশে তখন ভীষণ গোলমাল। প্রতাপাদিত্য তখন যশোহরের রাজা- তাঁহার বাহান্ন হাজার ঢালী, দশ হাজার ঘোড়সওয়ার। তিনি ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে দমন করিতে, মানসিংহকে পাঠাইলেন। মুঘল বাহিনী দিল্লী হইতে বর্ধমানে আসিয়া পৌঁছিল। ভবানন্দ মজুমদার সেখানে কর্ম করিতেন। তাঁহার কাছ হইতে সেনাপতি মানসিংহ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী শুনিলেন।

এই বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর নায়ক কাঞ্চীদেশের রাজপুত্র সুন্দর। সুন্দর কালীর প্রতি ভক্তিমান্। বর্ধমানের রাজকন্যা বিদ্যাকে গোপনে বিবাহ করায় সুন্দরের প্রতি বর্ধমানের রাজা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। কালীর চৌতিশা স্তব করিয়া সুন্দর কিভাবে এই দণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাই বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে কবি ভারতচন্দ্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মানসিংহ এই কাহিনী শুনিয়া কালীর মহিমা জানিতে পারিলেন।

অতঃপর মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। পথে এমন ঝড়-জল হইল যে, মানসিংহের তাঁবু জলে ভাসিয়া গেল। জলেব প্লাবনে তাঁহার কত হাতী ঘোড়া ভাসিয়া গেল; উটের গাড়ী সব পাঁকে আটকাইয়া গেল, সৈন্যসামন্ত কিছুই চলিতে পারিল না।

সেই দুর্যোগে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে রসদ জোগাইলেন। ভবানন্দের সাহায্য না পাইলে মানসিংহের সৈন্যদল অনাহারে প্রাণ হারাইত। এ ব্যাপার ঘটিল দেবী অন্নপূর্ণার অনুগ্রহে, কারণ ভবানন্দ মজুমদার ছিলেন দেবীর অনুগৃহীত। অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য দেখিয়া মানসিংহও তাঁহার পূজা করিলেন। তখন আকাশের মেঘ কাটিয়া গেল, ঝড়-জল থামিয়া গিয়া আকাশ আলোর হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এইবার মানসিংহ নির্বিবাদে যশোহরে পেঁৗছিলেন। প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে হারিয়া গেলেন। পরাজিত প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া মানসিংহ দিল্লী রওনা হইলেন। সঙ্গে ভবানন্দও গেলেন।

দিল্লী পেঁৗছিয়া বাংলায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সে সকল কথা মানসিংহ বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে জানাইলেন। কি করিয়া অন্নপূর্ণার অনুগৃহীত ভবানন্দের সহায়তায় তাঁহার সৈন্যদল দারুণ দুর্যোগের মধ্যেও রসদ পাইয়াছিল, সেকথা বাদশাহ শুনিলেন। দেবী অন্নপূর্ণার পূজা করিয়া কি উপায়ে তিনি ঝড়-বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়া যশোহরে পেঁৗছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাও মানসিংহ বলিলেন। এই সকল কথা উল্লেখ করিয়া মানসিংহ বাদশাহকে বলিলেন, "হুজুর, ভবানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিবার জন্য তাঁহাকে রাজ্য দিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনি এখন মত করিলেই হয়!" মানসিংহের কথা শুনিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ ত চটিয়া আগুন। হিন্দুর কোনও দেবীর অনুগ্রহে তাঁহার সৈন্যদল বিজয়ী হইয়াছে, একথা বাদশাহ বিশ্বাস করিলেন না। তিনি ভবানন্দ মজুমদারকে বন্দী করিলেন।

তখন ভবানন্দ এক মনে কালীর ধ্যান করিলেন, অন্নপূর্ণার স্তব করিলেন। প্রসন্না অন্নপূর্ণার বরে জাহাঙ্গীরের প্রহরীরা তাঁহাকে ছুঁইতে পারিল না— দিল্লীতে ডাকিনী-যোগিনী, দানব-প্রেতিনীর অত্যাচার সুরু হইল। উজীর-

নাজীরেরা অতিষ্ঠ হইয়া ভবানন্দের প্রতি সদয় হইবার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করিলেন। জাহাঙ্গীর নিজেও মহামায়ার পরিচয় পাইয়া ভবানন্দকে মুক্তি দিলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁহাকে জমিদারী দিলেন।

এইবার দেশে ফিরিয়া ভবানন্দ মজুমদার চৈত্রমাসে যথারীতি অন্নপূর্ণার পূজা করিলেন--তাঁহার সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার বংশধর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও নবাবের বিরাগভাজন হইয়া অন্নদার শরণ লইয়া বিপন্মুক্ত হইলেন এবং দেবীর আদেশেই ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণার মহিমাজ্ঞাপক "অন্নদা-মঙ্গল"-কাব্য রচনা করিলেন।

ভারতচন্দ্র এইরূপে একটি গল্পের সহিত আর একটি গল্প বুনিয়াছেন, এবং প্রত্যেকটি গল্পে হয় অন্নপূর্ণা, না হয় কালিকার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। প্রত্যেকটি গল্পে অন্নপূর্ণা বা কালীর অনুগ্রহে সমৃদ্ধি লাভের কথা অথবা বিপদ হইতে মুক্ত হইবার কথা আছে।

ভারতচন্দ্রের কবিতার চমৎকারিত্ব -মধুর শব্দপ্রয়োগে, রচনার অসাধারণ নৈপুণ্যে, বিচিত্র ছন্দ ব্যবহারে ও অসামান্য পাণ্ডিত্যে। তাঁহার কবিতায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের এক অপরূপ সমন্বয় হইয়াছে। তিনি মুখ্যতঃ শব্দ-কবি। এক শব্দের একাধিক অর্থ লইয়া তিনি দুই চারি চরণ যাহাই রচনা করিয়াছেন, সেগুলি যত্ন করিয়া মনে রাখিবার মত।

মধুর শব্দসমাবেশের দ্বারা মধুর ছন্দ-স্পন্দ সৃষ্টি করিতে তিনি কিরূপ দক্ষ ছিলেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

কল-কোকিল, অলিকুল বকুল-ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে॥
কমল পরিমল লয়ে শীতল-জল
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে॥
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী,
করিলা রাজধানী অশোক-মূলে॥

কুসুমে পুনপুন ভ্রমর গুণগুণ,
মদন দিল গুণ ধনুক হুলে।
যতেক উপবন কুসুম সুশোভন,
মধু-মুদিত-মন ভারত ভুলে॥

"অন্নদামঙ্গল"-কাব্যে এইরূপ শব্দ-সঙ্গীত অনেক আছে।

শব্দের ঘাতপ্রতিঘাতে ভাব এবং চিত্র দুই-ই ভারতচন্দ্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। মহাদেবের রুদ্র ভাব এবং মূর্তি বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেনঃ—

তরঙ্গভঙ্গিগত ভুজঙ্গরঞ্জিত কপর্দবিমর্দিত জটাধর।
গণেশশৈশব বিভূতিবৈভব ভবেশভৈরব দিগম্বর॥
ভুজঙ্গকুণ্ডল পিশাচমণ্ডল মহাকুতূহল মহেশ্বর।
রজঃপ্রভায়ত পদাম্বুজানত সুদিনভারত শুভঙ্কর॥

এখানে ছন্দের তরঙ্গের মধ্য দিয়া কবি শিবের জটার ছবি, সাপের কিলিবিলি, গঙ্গার তরঙ্গ—সবই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহা মনের মধ্যে একটা গম্ভীর ভাবের উদ্রেক করে। আবার ছন্দকে লঘু নৃত্যে বহাইয়া দিয়া বেণুবীণানিক্কণের মাধুর্য সৃষ্টি করিতেও তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রকে এখনও বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে গণ্য করা হয়।

রামপ্রসাদ সেন

কলিকাতার অনতিদূরে কুমারহট্ট নামক গ্রাম। গ্রামখানির পাশ দিয়া ভাগীরথী নদী তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নদীর জলে নামিয়া এক সাধক স্নান করিতেছেন, আর আপন মনে শ্যামা-সংগীত গাহিতেছেন। বাতাসে ভর করিয়া সেই গানের রাগিণী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া দিগ্‌দিগন্ত যেন মাতাইয়া তুলিতেছে।

এমনি সময়ে নদীবক্ষ দিয়া এক-খানি বজরা আর উহাকে ঘিরিয়া কয়েকখানি নৌকা ভাসিয়া যাইতেছিল। বজরার মধ্যে ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা—আশপাশের নৌকাগুলিতে তাঁহার বহু অনুচর, পাইক, বরকন্দাজ, আরও কত লোক!

হঠাৎ নদীর মাঝখানে বজরা থামিল সিরাজের হুকুমে। সিরাজ আদেশ দিলেন, "ঐ সাধককে বজরায় লইয়া আইস! আমি উঁহার গান শুনিব। এমন গান ত কখনও শুনি নাই!"

নবাবের আদেশে তাঁহার অনুচরেরা ঐ সাধক পুরুষটির কাছে নৌকা লইয়া আসিল এবং খুব সমাদর করিয়াই তাঁহাকে নবাবের কাছে লইয়া গেল। নবাব সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার গান শুনিতে চাহিলেন।

সাধক পুরুষটি ভাবিলেন যে নবাব যখন তাঁহার গান শুনিতে চাহিতেছেন, তখন তাঁহাকে গোটাকয়েক উর্দু গানই শুনাইয়া দেওয়া যাউক। বাংলা গান কি আর নবাব বাহাদুর বুঝিতে পারিবেন, না উহা তাঁহার ভাল লাগিবে! তাই তিনি একটি উর্দু গান গাহিতে সুরু করিলেন। কিন্তু সে গানে নবাবের তৃপ্তি হইল না। তিনি সাধক পুরুষটির মুখে শ্যামাসংগীত শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া সেখানে বজরা থামাইয়াছিলেন--যিনি একবার শ্যামাসংগীত শুনিয়াছেন তিনি কি অন্য কোন গান শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন? নবাব সাধক পুরুষটির গান থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "আপনি জলে দাঁড়াইয়া যে গান গাহিতেছিলেন, সেই গান গাহিয়া আমায় শুনান।"

সাধক উর্দু গান থামাইলেন। তাঁহার মুখে-চোখে যেন একটা অপরূপ জ্যোতির বিকাশ হইল, আনন্দে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ভক্তিতে তাঁহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি অন্তরের সমস্ত ঐকান্তিকতা ঢালিয়া দিয়া একটি একটি করিয়া কয়েকটি শ্যামাসংগীত নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে শুনাইলেন। নবাবের মনে আনন্দের বান ডাকিয়া গেল। তিনি মুগ্ধ হইয়া সাধক পুরুষটিকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইনিই হইতেছেন সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন। ইনিই শ্যামাসংগীতের আদি কবি বলিয়া পরিচিত, ইনিই আবার বাংলা আগমনী ও বিজয়া গানের আদি রচয়িতা।

রামপ্রসাদ ছিলেন একাধারে সাধক এবং কবি। এই সাধক-কবির রচিত শ্যামাসংগীত বা আগমনী ও বিজয়া গান শুনেন নাই, এবং শুনিয়া মুগ্ধ হন নাই এমন বাংগালী নাই বলিলেই চলে।

রামপ্রসাদী শ্যামাসংগীত, আগমনী ও বিজয়া গান বাংলা সাহিত্যের গৌরব। এমন গান ভারতের আর কোন প্রদেশে নাই, ভারতের আর কোন প্রদেশের লোকেরা এমন গান গাহিতে জানে না।

রামপ্রসাদী গানের বিশেষত্ব উহার সুরের মনোহারিত্বে ও ভাবের গভীরতায় ও অকৃত্রিমতায়। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে শ্যামা স্নেহময়ী মাতার ন্যায় কল্পিতা; আর, আগমনী ও বিজয়া গানে দেবী দুর্গা কন্যা উমা রূপে কল্পিতা। এই সকল গানে দেবীর সহিত ভক্তের এক মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। দেবীর ঐশ্বর্যের সহিত মিলন হইয়াছে মাধুর্যের। বাঙ্গালীরা একটা সম্ভ্রম-মিশ্রিত ভাব লইয়া যেমন দেব-দেবীর পূজা করিয়াছে, তেমনি আবার তাঁহাদের সহিত একটা নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক পাতাইয়া তবে স্বস্তি লাভ করিয়াছে। তাই দেখা যায় যে, এই বাংলা দেশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের একান্ত আপনার—আত্মার আত্মীয়। কোথাও তিনি কান্ত, কোথাও তিনি সখা, কোথাও বা মা যশোদার স্নেহপুত্তলি বালগোপাল রূপে কল্পিত। বৈষ্ণব কবিরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যেমন আত্মার আত্মীয় রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার সহিত মা যশোদার এবং বৃন্দাবনের বালকগণের একটা স্নেহসম্পর্ক কল্পনা করিয়াছিলেন, রাম-প্রসাদও সেইভাবে স্নেহময়ী জননীরূপে কালীকে কল্পনা করিয়া গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, উমাকে ভক্ত বাঙ্গালীর স্নেহপুত্তলি রূপে কল্পনা করিয়া সঙ্গীতস্রোতে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাতে একটা সম্ভ্রমমিশ্রিত ভাব থাকে; ফলে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একটা ব্যবধানও থাকিয়া যায়। দেবতার পাদপদ্মে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভগবানের সহিত নিবিড় মিলন অথবা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপিত হইল না বলিয়া মনের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা ও অসার্থকতা বোধ ভক্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে। আরাধ্য দেবতার সহিত বাঙ্গালী চায় নিবিড়তর মিলন। তাই রামপ্রসাদী গান দেবীর প্রতি শুধু ভক্তির কথায় পরিপূর্ণ নহে; সেখানে দেবী কখনও জননী, কখনও কন্যারূপিনী—জননী ও কন্যা রূপে তিনি বাঙ্গালীর ভালবাসা, স্নেহ-প্রেম-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন।

রামপ্রসাদ নিজে শ্যামা মায়ের ভক্ত ছিলেন। তিনি তন্ত্র-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কালীর সাধনা করিতেন,—কখনও-বা শাস্ত্রের মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া, নিজেই মুখে মুখে শ্যামা মায়ের বন্দনা-গান রচনা করিয়া পূজার অর্ঘ্য দিতেন।

সরল শিশু মাতার প্রতি ভক্তিমিশ্রিত ভাব লইয়াই আদর-আব্দার প্রকাশ করে, রামপ্রসাদের গানে শিশুর সেই সরলতা প্রকাশিত। তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতে দেখা যায় যে, কবি কখনও শ্যামা মায়ের সহিত মান-অভিমান করিতেছেন, কলহ করিতেছেন—কখনও বা আব্দারে ছেলের মত স্নেহের দাবী জানাইতেছেন; আবার কখনও অভিমানভরে মাকে গালি দিতেছেন। কিন্তু সেই গালি কপট,— উহা স্নেহ, ভক্তি ও আত্মসমর্পণের রসে পরিপূর্ণ।

রামপ্রসাদ সেন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট বা হালিশহর গ্রামে এক বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন, পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ সেনের পিতা ও পিতামহ শক্তির উপাসক ছিলেন, কবিও শক্তির উপাসক ছিলেন।

বাল্যকালে রামপ্রসাদ তাঁহার গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি কিছুকাল এক সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে পড়িয়াছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত-জ্ঞান তাঁহার ছিল। এক মৌলভীর নিকট ফারসী শিক্ষা করিয়া তিনি ঐ ভাষায়ও কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বালক-বয়সেই রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরভক্তির বিকাশ ঘটিয়াছিল। মাত্র ষোল বৎসর বয়স হইতেই তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতেন, আর আপন মনে সে সকল আবৃত্তি করিতেন। কালী-ভক্তিই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির উৎস।

শ্যামা মায়ের বন্দনা-গান রামপ্রসাদের অন্তর হইতে আপনা আপনিই উচ্ছ্বসিত হইত। ঐ গান গাহিয়া তিনি বড় আনন্দেই আত্মভোলা হইয়া কাল-যাপন করিতেছিলেন। বিষয়কর্মে তাঁহার মন যাইত না। কিন্তু অকস্মাৎ কবির পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিষয়নিঃস্পৃহ কবিকে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করিতে হইল। বহু চেষ্টার পর কলিকাতার এক ধনবানের গৃহে মুহুরীগিরির কাজও তাঁহার জুটিল। ভাবুক কবি চাকুরী লইয়া হিসাব-রক্ষার কাজ করিতে লাগিলেন। বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

কিন্তু রামপ্রসাদ তাঁহার আরাধ্য দেবতা কালীর কথা ভোলেন নাই। হিসাবের খাতার মধ্যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত রাখিতে পারিলেন

না; হিসাব কষিতে কষিতে হিসাবের পাকা খাতার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ভক্তির আবেগে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া গান লিখিয়া রাখিতেন।

কবি ধনীর সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করিতেন। কিন্তু তাহা ভুলিয়া তিনি নিজেকে কালীর কিঙ্কর ভাবিয়া একদিন লিখিয়া বসিলেন—

আমায় দে মা তহবিলদারী
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী!

এমনি অনেক গানে তাঁহার হিসাবের খাতার পাতাগুলি পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

দৈবক্রমে একদিন ঐ হিসাবের খাতা গিয়া পড়িল রামপ্রসাদের উপরিতন এক কর্মচারীর হাতে। খাতার অষ্ট-পৃষ্ঠে গান লেখা রহিয়াছে দেখিয়া কর্মচারীটির ত চক্ষুস্থির! তিনি চটিয়া গিয়া খাতা লইয়া ছুটিলেন মনিবের কাছে, নালিশ করিলেন রামপ্রসাদের নামে, আর রামপ্রসাদের কাণ্ড-কারখানার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে তাঁহার সম্মুখে হিসাব ও কবিতার জালে জটপাকানো খাতাখানি খুলিয়া ধরিলেন।

ভাগ্যবশে রামপ্রসাদ এক ভক্তিমান্ গুণগ্রাহী মনিব পাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশ এই উদার-প্রকৃতি ধনবান্ পুরুষটির নাম মনে করিয়া রাখে নাই। রামপ্রসাদের মনিব সব দেখিয়া শুনিয়া রাগ ত করিলেনই না, বরং তিনি রামপ্রসাদের ভক্তির ঐকান্তিকতা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া পরম সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "বাপু! তুমি এই সংসারের কাজ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই। বৈষয়িকতা তোমার সাজে না। তুমি জগজ্জননীর কাছে যে তহবিলদারী চাহিয়াছ, তাহা তুমি সময় হইলেই পাইবে। এখন তুমি নিজের গৃহে যাইয়া সাধনা কর এবং গান লিখ। গান লিখিয়া তুমি আমার দফ্তরখানার খাতা নষ্ট কর নাই। বরং তোমার গান-রচনায় আমার খাতা পবিত্র হইয়াছে। আমার দফ্তরে বংশানুক্রমে ঐ খাতা থাকিবে এবং উহা তোমার ভগবদ্ভক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এখন তুমি গৃহে যাও, সেখানে বসিয়া তুমি আমার সেরেস্তা হইতে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা বৃত্তি পাইবে।"

অতঃপর রামপ্রসাদ কুমারহট্টে ফিরিয়া গেলেন এবং সংসারচিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া কালীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

যে সময়কার কথা হইতেছে তখন এই বাংলাদেশে একজন বিদ্যোৎসাহী জমিদার ছিলেন। ইনি হইতেছেন কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহারই রাজসভায় কবি ভারতচন্দ্র সমাদৃত হইয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে কার্যোপলক্ষে কুমারহট্টে আসিতেন। তিনি রামপ্রসাদের খ্যাতি শুনিয়া একদিন এই কবিকে আহ্বান করিয়া তাঁহার গান শুনিলেন এবং এমনই মোহিত হইলেন যে, তাঁহাকে নিজের রাজসভায় লইয়া যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিষয়নিঃস্পৃহ কবি মহারাজের সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' এই উপাধি দান করিয়াছিলেন এবং একশত বিঘা নিষ্কর জমি উপহার দিয়াছিলেন। মহারাজের অনুরোধে রামপ্রসাদ "বিদ্যাসুন্দর" ও "কালীকীর্তন" নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু রামপ্রসাদের যশ এই দুইখানি কাব্য-রচনার জন্য নহে—তাঁহার যশ সংগীত-রচনার জন্য। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—

গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি, গানে রবে ব্যস্ত।

প্রথম জীবন হইতে রামপ্রসাদ ধর্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তিতে প্রীত হইয়া জগন্মাতা যে তাঁহাকে সশরীরে দেখা দিয়াছিলেন এই কাহিনীটি বাংলাদেশে সুবিদিত। শুনা যায়, একদিন তিনি ঘরের বেড়া বাঁধিতেছিলেন, ঐ সময়ে সাহায্য করাব জন্য তাঁহার কন্যাকে বেড়ার অপর পার্শ্বে থাকিয়া বেড়ার ছিদ্রপথে দড়ি ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ ঐভাবে দড়ি ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার কন্যা গৃহকার্যে চলিয়া যায়। কন্যা কখন যে চলিয়া গিয়াছে, রামপ্রসাদ তাহা টের পান নাই। তিনি একমনে বেড়া বাঁধিতেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে তাঁহার কন্যারই মত কে একজন যেন শেষ পর্যন্ত দড়ি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

বেড়া বাঁধা শেষ করিয়া রামপ্রসাদ যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার কন্যা সেখানে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তোমার কি বেড়া-বাঁধা

শেষ হইয়া গিয়াছে?" রামপ্রসাদ বলিলেন, "হাঁ।" তাঁহার কন্যা পুনরায় বলিল, "কিন্তু বেড়া-বাঁধার দড়ি ফিরাইয়া দিল কে?" রামপ্রসাদ তাঁহার কন্যার কথায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন, তুমিই ত দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলে!" রামপ্রসাদের কথা শুনিয়া তাঁহার কন্যা উত্তর দিল, "না বাবা! আমি ত খানিকক্ষণের জন্য চলিয়া গিয়াছিলাম। আমি ত বেড়ার ওধার হইতে দড়ি ফিরাইয়া দিই নাই!" ইহাতে রামপ্রসাদ বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "তবে কি স্বয়ং জগদীশ্বরী আসিয়া এতক্ষণ আমার বেড়া বাঁধায় সাহায্য করিতেছিলেন?" স্বয়ং জগজ্জননী তাঁহাকে দেখা দিয়া গিয়াছেন, -এই আনন্দে তিনি তখনই গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া উঠিলেন-

মন, কেন মার চরণ ছাড়া?
ও মন, ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া!

জগজ্জননীকে চিনিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার মনে বড় অনুতাপ হইল। তাই তিনি আরও গাহিলেন-

সময় থাকতে না দেখলে মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া!
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে,
বাঁধেন আসি' ঘরের বেড়া॥

*   *   *

যেই ধ্যানে একমনে
সেই পাবে কালিকা তারা॥
বার হয়ে দেখ কন্যা রূপে,
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥

রামপ্রসাদের সকল গানেই একটা সরল উদার আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার সংকীর্ণতা ছিল না, শাক্ত বৈষ্ণব কোন প্রকার

সাম্প্রদায়িকতাবোধ বা অন্ধ বিদ্বেষ ছিল না। জাঁকজমকের সহিত দেবী-পূজার তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁহার গানে তিনি বলিয়া গিয়াছেন—পূজায় বাহিরের আড়ম্বর বা জাঁকজমক মনে অহংকারের সঞ্চার করে। ঐ অহঙ্কার হৃদয়কে ভক্তিরসে আপ্লুত করে না, বরং অন্তরের ভক্তির উৎসমুখ বন্ধ করিয়া দেয়। কেবল মূর্তিপূজার অসারতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কবির সেই অনুভূতি তাঁহার গানে ব্যক্ত হইয়াছে—তিনি গাহিয়া গিয়াছেন,—

মন তোর এত ভাবনা কেনে?
একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে!
জাঁকজমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি', বসাও হৃদি-পদ্মাসনে॥
আলো চাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর সে আয়োজনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্ত কর আপন মনে॥
ঝাড়-লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনাইয়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জেবলে, দাও না জলুষ নিশি-দিনে॥
মেষ-ছাগল-মহিষাদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী, জয় কালী বলে, দেও বলি ষড়রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কি রে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলি' দেও করতালি,
মনে রাখো সেই শ্রীচরণে॥

রামপ্রসাদ নিজে মূর্তি পূজা করিতেন, কিন্তু বিশ্বের সকল সৃষ্টির মধ্যে তিনি তাঁহার আরাধ্যা দেবীমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না?
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না!

ওরে ত্রিভুবন সে মায়ের মূর্তি,
জেনেও কি তাই জান না!
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্তি,
গড়িয়ে করিস উপাসনা?

জগজ্জননীর বাহ্যপূজার অসারতা তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাই যে দেবী সমস্ত জগৎকে নানান্ সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, কত রঙে, রূপে, ফুলে ও ফলে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে ডাকেব গহনা পরাইয়া পূজা করার নিরর্থকতার কথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন—

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোনা,
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা।

সাধারণ মানুষ বিশ্বপালয়িত্রী অন্নদাত্রী দেবীকে আলোচাল প্রভৃতির নৈবেদ্য দান করিয়া এবং পশু বলি দিয়া তুষ্ট করিতে চাহে। কিন্তু রামপ্রসাদ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কোন সার্থকতাই দেখিতে পান নাই—

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা,—
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়,
আলোচাল আর বুট ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা,
পশুপক্ষী কীট নানা;
ওরে, কেমনে দিতে চাস বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা।

রামপ্রসাদের পদাবলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মর্মের বিশ্বাস ও বলিষ্ঠতা। দুঃখকে তিনি ডরান না, তিনি বলেন,—

ভূতলে আনিয়ে মাগো,
করলে আমায় লোহা পেটা;

আমি তবু কালী ব'লে ডাকি,
সাবাস্ আমার বুকের পাটা!

তাঁহার বীরত্ব-ঘোষণা মৃত্যু ও যমের বিরুদ্ধেই বেশী—

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে, আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা।
বল্‌গে যা তোর যমরাজারে
আমার মতন নেছে কটা।
আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা!

বস্তুতঃ রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের তুলনা নাই। তাঁহার রচিত আগমনী ও বিজয়াগানও অনুপম।

পতিগৃহবাসিনী কন্যার জন্য বাঙ্গালীর অন্তরে যে বিচ্ছেদব্যথা গুমরিয়া উঠে, আর পিত্রালয়ে কন্যার আগমন উপলক্ষ্যে বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে যে আনন্দ-তরঙ্গ খেলিয়া যায়,—সেই বিচ্ছেদব্যথা ও আনন্দোচ্ছ্বাস রামপ্রসাদের আগমনী গানে রূপ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী উমাকে কন্যা রূপে কল্পনা করিয়াছে, কবি রামপ্রসাদ বাঙ্গালীর সেই ভাবপ্রবণতাকেই তাঁহার আগমনী গানে মূর্তি দান করিয়াছেন।

বাংলা দেশে শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। শরতের মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যদেবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক যখন সোনার আলোয় ঝলমল করিয়া উঠে, শিশিরস্নাত শিউলিগুলি যখন অরুণালোকচ্ছটায় তাহাদের শুভ্রহাসি ছড়াইতে থাকে, কুন্দশুভ্র মেঘমালা যখন আকাশে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায়,—তখন স্বতঃই বাঙ্গালী মায়ের মন দূরদেশবাসিনী কন্যার মুখখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়। তাঁহারা তখন আপন আপন কন্যার আগমন-প্রতীক্ষায় দিন গণিতে থাকেন। কন্যাবিচ্ছেদকাতরা বাংলার জননীদের মনের ভাব তখন উমার দর্শনাভিলাষিণী মেনকার মতই যেন রহিয়া রহিয়া বলিতে থাকে—

কবে যাবে বল গিরিরাজ আনিতে গৌরী।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ দেখিতে উমারে হে॥

আবার,

গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌ব না॥

তারপর দেবী ভগবতী যখন বাঙ্গালীর ঘরে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহাকেই কন্যা রূপে ভাবিয়া বাঙ্গালী জননীরা অফুরন্ত স্নেহ দিয়া যেন চিরদিনের জন্য ঘিরিয়া রাখিতে চাহেন, কিন্তু পারেন না। মিলনের আনন্দে তিনটি দিন স্বপ্নের মত গড়াইয়া যায়। তখন আসন্ন বিচ্ছেদব্যথায় অধীর অন্তঃকরণ বলিয়া উঠে—'যেতে নাহি দিব'; বলে—

ওরে নবমীনিশি!
না হইও রে অবসান!
তুমি অস্তে গেলে নিশি,
অস্তে যাবে উমাশশী
হিমালয় আঁধার করে।
গেলে তুমি দয়াময়ি এ পরাণ যাবে!
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!

কিন্তু মায়ের করুণ প্রার্থনা ব্যর্থ হইয়া যায়—নবমীর নিশি পোহাইয়া যায়, আসে বিজয়া দশমী, প্রতিমা বিসর্জনের পালা। তারপর বিসর্জনের জন্য প্রতিমা যখন লইয়া যাওয়া হয়, তখন বাঙ্গালী মায়েরা দেবীকে বিদায় দেন অশ্রুভরা চোখে,- যেন নিজ কন্যাকেই পুনরায় তাঁহারা পতিগৃহে পাঠাইতেছেন। এই করুণ দৃশ্যেই বিজয়া গানের উৎপত্তি।

রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়া গান—সকলই কবির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সৃষ্টি। তাঁহার রচনায় কাব্যসৃষ্টির কোন অস্বাভাবিক চেষ্টা নাই, কোন কৃত্রিমতা নাই। সারল্যে, সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে সঙ্গীতগুলি পরিপূর্ণ। শ্যামা মায়ের ভাবে ভাবিত হইয়া আজীবনই তিনি পল্লীগ্রামে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতার চিত্রগুলিও তিনি পল্লী-অঞ্চল হইতেই

সংগ্রহ করিয়াছেন,—সেই কলুর চোখ-ঢাকা বলদ, সেই ঘুঁড়ি ওড়ান প্রভৃতি অতি-পরিচিত পল্লীচিত্রই তাঁহার কাব্যে দেখিতে পাই। প্রাত্যহিক জীবনে সুপরিচিত তুচ্ছ বস্তুর সাহায্যে তিনি নিজের সাধনালব্ধ সত্যানুভূতিকে সর্বজনবোধ্য ও মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ অতি সহজ ও সরল ভাষায় তাঁহার গানগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

মাতৃপাদপদ্ম তাঁহার হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল, নূতন আলো জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তাই আজীবন সুখে-দুঃখে সকল অবস্থাতেই তিনি বড় আনন্দে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন,—

দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই।

দীর্ঘকাল পূর্বে কবি রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার গানের মধ্যে অমর হইয়া আছেন। তাঁহার গান আজও বাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে গীত হইয়া থাকে, বাংলার কৃষককুল হইতে ধনীর দুলাল পর্যন্ত সকলের কাছেই তাঁহার গান আদরের সামগ্রী। তাঁহার গানে বাঙ্গালী জনসাধারণ তাহাদেরই হৃদয়ানুভূতি অভিব্যক্ত দেখিয়াছে।

বাংলার জাতীয় জীবনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হয়। তখন পাশ্চাত্ত্য ভাষা, সাহিত্য এবং সামাজিক রীতি-নীতি ও ভাবধারার প্রভাব বাংলায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের পূর্বাভাস সূচিত করিতেছিল। কি সাহিত্যের সংস্কারে, কি সমাজ অথবা ধর্মের সংস্কারে—বাঙগালী তখন এক নূতন উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তখন পুরাতন কুপ্রথাসমূহের মূলোচ্ছেদ হইতেছে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙগালীর পুরাতন রুচি ও প্রবণতার পরিবর্তন ঘটিতেছে। বাংলা গদ্য ইহার অল্প পূর্বে মিশনারীগণের সাধনায় সাহিত্যের বস্তু হইয়া স্বীকৃত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি একদিকে উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন,—অপরদিকে তাঁহারাই আবার বাংলা গদ্য-ভাষাকে শক্তিশালিনী করিতেছেন, উহাকে সকল প্রকার ভাব-প্রকাশের উপযোগী সামর্থ্য দান করিতেছেন। গদ্য-ভাষার শক্তিসাধনে তখন এই দুই মনীষীর সহিত যোগদান করিয়াছেন অক্ষয়কুমার দত্ত। রামমোহন রায় ধর্মালোচনার দ্বারা, বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যশ্রী-পরিস্ফুটনের দ্বারা এবং অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞানালোচনার দ্বারা বাংলা গদ্যকে এক অভিনব পথে পরিচালিত করিতেছিলেন। বিষয়-বৈচিত্র্যে ও প্রকাশ-সামর্থ্যে বাংলা গদ্যের এক অভাবনীয় বিকাশ হইতেছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অথবা নাট্য-সাহিত্যের কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয় নাই। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তখনও অল্পবিস্তর প্রাচীন আদর্শই অনুসৃত হইতেছে,--সে যুগের কবিদিগের উপর তখনও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বাংলা নাটক দুই এক খানি যাহা প্রকাশিত হইত তাহাও সংস্কৃত নাটকের আদর্শে রচিত হইতেছিল। অথচ ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বাঙ্গালী তখন সাহিত্যের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্ত্য ভাবরসের আস্বাদনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মনের তৃষ্ণা মিটাইবার মত সামর্থ্য বাংলা কবিতা বা নাটক তখনও লাভ করে নাই। পাশ্চাত্ত্য কবিদিগের অনুসৃত যুগোপযোগী আদর্শ, অথবা পাশ্চাত্ত্য কাব্যের নব নব সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত করাইয়া দিবার মত সামর্থ্য লইয়া কোন প্রতিভাবান্ যুগন্ধর কবির তখনও প্রকাশ ঘটে নাই। নাটকের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ।

ঠিক এই সময়ে অসাধারণ প্রতিভা লইয়া মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হ'ন। প্রকৃতিদত্ত কবিপ্রতিভা এবং অসাধারণ অধ্যবসায় ও আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে এই কবি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট করিলেন, গাম্ভীর্যে ও ভাববৈচিত্র্যে বাংলা ভাষাকে তিনি সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। মহাকাব্য, গীতিকবিতা, খণ্ডকবিতা, নাটক, প্রহসন- সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধুসূদন তাঁহার সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিলেন। নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও নূতন কল্পনাভঙ্গি লইয়া বিবিধ সাহিত্যিক প্রচেষ্টা দ্বারা মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের রীতি ও প্রকৃতিকে একেবারে বদলাইয়া দিলেন, উহার ইতিহাসে আধুনিক যুগের শুভ উদ্বোধন করিলেন। মধুসূদনই বঙ্গসাহিত্যকে সর্বপ্রথম আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষা দান করেন। সাহিত্যের রূপ ও রসের মধ্যে এক অভিনব সঙ্গীত, ধ্বনি ও প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যকে নূতন করিয়া গঠিত করেন। বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করেন বিদ্যাসাগব, অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিম। বাংলা কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করেন মধুসূদন।

যশোহর জেলায় কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪

খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী কবিবর মধুসূদনের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ছিল রাজনারায়ণ দত্ত, মাতার নাম জাহ্নবী দেবী।

অতি বাল্যকাল হইতে মধুসূদনের চরিত্রে দুইটি গুণ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে—প্রথমতঃ, পাঠে, বিশেষতঃ কাব্যপাঠে অনুরাগ, দ্বিতীয়তঃ কাব্যরচনায় অনুরাগ। বিদ্যাশিক্ষায় কখনও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না—জ্ঞান আহরণের জন্য অদম্য একটা উৎসাহ তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত। কি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায়, কি যৌবনে হিন্দু কলেজে অথবা বিশপ্‌স্ কলেজে কখনও ইনি কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এক-দিকে এই অধ্যয়নানুরাগ তাঁহার শৈশবে স্ফুরিত হইয়া আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল, অন্যদিকে তাঁহার কাব্যরচনার আকাঙ্ক্ষা ও তদুপযোগী ভাবপ্রবণতা - তাহাও শৈশবে উদ্বুদ্ধ হইয়া আজীবন তাঁহার মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল।

মধুসূদনের এই ভাবপ্রবণতার স্ফুরণ ও বিকাশে তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অ-কবিকেও কবি করিয়া তুলে, যাঁহার মধ্যে কবিত্বশক্তি থাকে তাঁহার ত কথাই নাই। মধুসূদনের মধ্যে প্রকৃতিগত কবিত্বশক্তি ছিল। সেই কবি-প্রতিভা কপোতাক্ষ নদীতীরের ও সাগরদাঁড়ি গ্রামের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে উদ্ভিন্ন হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, রামায়ণ-মহাভারতের অনুশীলন এবং হিন্দু কলেজ ও বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়নও তাঁহার কবিপ্রতিভার উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিল। অতি শৈশবেই তিনি তাঁহার জননীর নিকট রামায়ণ-মহাভারত পাঠ শুনিতেন, আর উহা শুনিতে শুনিতে ভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন। রামায়ণ-মহাভারত যাবজ্জীবন তাঁহার আদরের বস্তু ছিল।

যৌবনে মধুসূদন যখন ইউরোপীয় সাহিত্য অনুশীলন করিয়া পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখনও রামায়ণ-মহাভারতে তাঁহার প্রীতি কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। পরিণত বয়সে তিনি নয়টি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ফারসী, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালীয়—এতগুলি ভাষা মধুসূদন অনুশীলন করিয়াছিলেন, ঐ সকল ভাষার সাহিত্যরসও তিনি সাক্ষাৎভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি

তাঁহার শৈশব-সহচর কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসকে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার পরও তাঁহার মনে রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি অনুরাগ অক্ষুন্ন ছিল। তাঁহার জনৈক বন্ধু একবার তাঁহাকে রামায়ণ-মহাভারত পড়িতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "একি, সাহেব লোকের হাতে এই সব বই কেন?" উত্তরে কবি বলিলেন, "সাহেব বলিয়া কি রামায়ণ-মহাভারতও তোমরা আমায় পড়িতে দিবে না! রামায়ণ-মহাভারত পড়িতে আমার কেমন যেন ভাল লাগে। এই গ্রন্থ দুইখানি না পড়িয়া আমি থাকিতে পারি না।" রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্র প্রভৃতিকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার প্রায় সকল কাব্যগ্রন্থ রচিত।

কিন্তু শুধু রামায়ণ-মহাভারত নহে, মুকুন্দরামের "চণ্ডীমংগল", ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" প্রভৃতি কাব্যের অনুশীলন করিয়াও তিনি আনন্দ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল কবির প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা তিনি তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাগুলির মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন প্রথম যৌবনে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। সেখানে তিনি ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন্ নামক এক অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন্ ছাত্রদিগের রসাস্বাদনী শক্তিকে উদ্দীপিত করিতেন, তাহাদিগকে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে শিখাইতেন, তাহাদিগের কল্পনার বিকাশ যাহাতে ঘটে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ভাবপ্রবণ মধুসূদনের কল্পনাবৃত্তি সুগঠিত হইল, তাঁহার কবিত্বশক্তির উন্মেষ ঘটিল। হিন্দু কলেজে থাকিতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তবে তখন তিনি বাংলায় কবিতা রচনা করিতেন না, রচনা করিতেন ইংরাজী ভাষায়। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল জন্মিয়াছিল, এবং ইংরাজীতে তিনি বহু উৎকৃষ্ট কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে কাব্য রচনা করিয়াই মধুসূদন বিশ্ববিখ্যাত কবি হইবেন, এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। এমন কি, কেহ কেহ বলেন,—পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দীক্ষিত করিয়া, পাশ্চাত্ত্যের ভাবে ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইংরাজীতে কাব্য-

রচনার মানসেই তিনি ঐ সময়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইহাতে তিনি আর হিন্দু কলেজে ছাত্র থাকিতে পারেন নাই, কারণ হিন্দু ভিন্ন হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের অধিকার তখন আর কাহারও ছিল না। সুতরাং মধুসূদন তখন বাধ্য হইয়া ঐ কলেজ ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান মিশনারীগণ-পরিচালিত শিবপুর বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি পাশ্চাত্ত্যের নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

হিন্দু কলেজে মধুসূদনের কবিত্বশক্তির যে বিকাশ ঘটিয়াছিল, বিশপ্‌স্ কলেজে নানাবিধ পাশ্চাত্ত্য ভাষা অনুশীলনের দ্বারা তাহা পরিপুষ্ট হইবার সুযোগ লাভ করে। এইজন্য বলা যায় যে, হিন্দু কলেজে ও বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়নও মধুসূদনের কবিত্বশক্তির উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিল। বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়নকালেও তিনি ইংরাজীতেই কাব্যরচনা করিতেন।

বিশপ্‌স্ কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মধুসূদন মাদ্রাজ যাত্রা করেন এবং তথাকার দেশীয় খৃষ্টানগণের সাহায্যে তদ্দেশীয় ছাত্রগণের অধ্যাপনা সুরু করেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার বিখ্যাত ইংরাজী কাব্য "ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী" (Captive Lady) রচনা করেন। ইতিপূর্বে তিনি ইংরাজীতে ছোট ছোট কবিতা রচনা করিতেছিলেন। "ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী"ও অসম্পূর্ণ কাব্য। কাব্যখানি রচনা করিয়া মধুসূদন উহা তাঁহার অন্যতম সুহৃৎ গৌরদাস বসাক মহাশয়কে পাঠাইয়া দিলেন এবং অনুরোধ করিলেন, "কোন ইংরাজ পণ্ডিতকে দেখাইয়া বইখানি একবার যাচাই করিয়া লইও এবং এই বই-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত আমাকে জানাইও।"

মধুসূদনের অনুরোধক্রমে গৌরদাস বসাক "ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী" বইখানি স্বনামধন্য ড্রিংকওয়াটার বেথুনকে পড়িতে দিলেন। তিনি এই কাব্যগ্রন্থ পড়িয়া যাহা জানাইলেন তাহার মর্ম এই—"আপনার বন্ধুকে বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিতে বলিবেন। ইংরাজী সাহিত্যের চর্চা করিয়া তিনি যে সমুচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতি লাভ করিয়াছেন, মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে তাহা নিয়োজিত করিলেই তিনি অক্ষয় যশ লাভ করিতে পারিবেন।"

এই অবিস্মরণীয় উপদেশ-বাণীতে মধুসূদনের আত্মচেতনা ফিরিয়া আসিল, তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার যতই অধিকার থাকুক না কেন, বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া তাঁহার পক্ষে অমরতা লাভ করা কিছুতেই সম্ভব নহে—আপন মাতৃ-ভাষার অনুশীলনই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিতে পারে। সুতরাং তিনি তখন হইতে পরিশ্রমসহকারে বাংলা ভাষার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এজন্য তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাষা বা সাহিত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন না। মধুসূদনের মনে এই সংকল্প ছিল যে, বাংলা কাব্য, নাটক, প্রভৃতির মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিনব সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠ কল্পনাদর্শ প্রবাহিত করাইয়া দিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা করিবেন। কবির এ সংকল্প ও সাধনা ফলবতী হইয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্য ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি সৌভাগ্যক্রমে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং ইহা হইতেই তিনি তাঁহার প্রতিভাবিকাশের সুযোগ লাভ করেন।

তখন বাংলা দেশে অভিনয়ের উপযোগী উৎকৃষ্ট নাটক নাই দেখিয়া মধুসূদন নিজেই নাটক লিখিতে সংকল্প করেন এবং পর পর "শর্মিষ্ঠা" ও "পদ্মাবতী" নামক দুইখানি নাটক এবং "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামে দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়া নিজের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। সুতরাং নাটক-রচনার মধ্য দিয়া মধুসূদনের প্রতিভার প্রথম উন্মেষ ঘটিল। একদিন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে মধুসূদন সংকল্প করেন যে, তিনি বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটি কাব্য রচনা করিবেন। সেই সংকল্প অনুসারে তিনি "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" রচনা করিয়া বঙ্গবাসীকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করেন। প্রথমে কয়েকজন রস-গ্রাহী ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণে তাঁহার এই নবপ্রবর্তিত অমিত্রচ্ছন্দ পছন্দ করেন নাই।

কিন্তু তিনি "মেঘনাদবধ কাব্য" ও "বীরাঙ্গনা কাব্য" রচনা করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি ও মাধুর্যের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মধুসূদনের আবাল্য আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনি ইংলণ্ডে যাইবেন, তাঁহার ধারণা ছিল- ইংলণ্ডে গমন করিলেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবি হইতে পারিবেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, কিন্তু কবিহিসাবে তাঁহার খ্যাতির সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠা দুই-ই স্বদেশে থাকিতেই হইয়াছিল। তিনি "শর্মিষ্ঠা" ও "পদ্মাবতী" নাটক, "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসন এবং "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য", "মেঘনাদবধ কাব্য", "ব্রজাঙ্গনা কাব্য", "কৃষ্ণকুমারী নাটক" ও "বীরাঙ্গনা কাব্য" এই কয়খানি গ্রন্থ স্বদেশে থাকিতেই রচনা করিয়া রসস্রষ্টা মহাকবির খ্যাতি লাভ করেন। ববং ইংলণ্ডে যাইবার কাল হইতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার ক্রমশঃ হ্রাস ঘটিতে থাকে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টার হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করেন এবং প্রায় পাঁচ বৎসরকাল ইউরোপে অবস্থান করেন। ঐ সময়ে দারুণ অর্থ-কষ্টে কাতর হইয়া তিনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হ'ন এবং তাঁহারই সহায়তায় ঋণমুক্ত হইয়া ও ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

ইউরোপে অবস্থানকালে ফ্রান্সের অন্তর্গত ভার্সাই নগরে মধুসূদন কিছুকাল ছিলেন। তখন তিনি তাঁহার "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" রচনা করেন। ইউরোপে অবস্থানকালে ইহাই তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

বঙ্গভাষায় 'সনেট' জাতীয় কবিতা ছিল না। মধুসূদনই এই শ্রেণীর কবিতা বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বহু কবি এই জাতীয় কবিতা রচনা করিয়া নিজ নিজ কবিত্বের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি দেখাইয়াছেন। এখনও অনেক কবি 'সনেট' রচনা করিতেছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর কবিতা-রচনার পথপ্রদর্শক মধুসূদন—ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে নূতন রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন; এজন্য তিনি যুগপ্রবর্তক মহাকবি বলিয়া চিরকাল সমাদৃত হইবেন। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। তিনিই বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রহসনরচয়িতা। বিয়োগান্তক নাটক মধুসূদনই বঙ্গসাহিত্যে প্রথম রচনা করেন; তাঁহার "কৃষ্ণকুমারী" নাটকখানি বিয়োগান্তক। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া কাব্য ও নাটক রচনার এবং বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে কবিতা-রচনার পথপ্রদর্শকও তিনিই। তাঁহার "ব্রজাঙ্গনা" কাব্য বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে রচিত। উহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর আধ্যাত্মিকতা বা অতীন্দ্রিয়তা নাই সত্য, কিন্তু রসঘন কবিত্ব আছে। এই কাব্যের ভাষা ও ছন্দ বঙ্গসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তিনি "বীরাঙ্গনা" নামক পত্রকাব্য রচনা করিয়াছেন, "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" রচনা করিয়াছেন। মধুসূদনের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পত্রকাব্য বা চতুর্দশপদী কবিতা কোনটিই ছিল না। "বীরাঙ্গনা" কাব্যে তিনি বীর ও করুণ রসের এক অপরূপ সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, আবার এই কাব্যেই তিনি গুরুগম্ভীর অমিত্রাক্ষর ছন্দকে লঘুনৃত্যে বহাইয়া দিয়াছেন। সর্বোপরি মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "মেঘনাদবধ" মহাকাব্য, উহা বঙ্গসাহিত্যের তথা ভারতীয় সাহিত্যের মুকুটমণি। ইহার উপরই তাঁহার অমরত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত।

"মেঘনাদবধ" কাব্যের আখ্যায়িকা রামায়ণ হইতে গৃহীত। রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক রাবণের পুত্র মেঘনাদের নিধন ইহার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু প্রাচ্যের এই বিষয়বস্তু-বর্ণনায়, বহুগ্রন্থপাঠী মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য বহু কাব্য হইতে নানা উপকরণ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। গ্রীস দেশের মহাকবি হোমরের "ইলিয়াড্" ও "অডেসী", ইতালীয় কবি ভার্জিলের "ইনিড", দান্তের "ডিভাইন কমেডি", ট্যাসোর "জেরুজালেম ডেলিভার্ড", ইংরাজ কবি মিল্টনের "প্যারাডাইস্ লষ্ট", এবং বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের "রামায়ণ", ব্যাসদেব ও কাশীরাম দাসের "মহাভারত", কালিদাসের "কুমারসম্ভব", "শকুন্তলা" ও "রঘুবংশ" প্রভৃতি কাব্যের ভাব, কল্পনা ও বিষয়বস্তুর দ্বারা "মেঘনাদবধ" কাব্যের সৌন্দর্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কবিদিগের

কাব্যের যাহা কিছু বিশিষ্ট সম্পদ তাহাকে নূতনতর সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া মধুসূদন "মেঘনাদবধ" কাব্যের মধ্যে পরিবেশন করিয়াছেন। এই অনুকরণে কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয় নাই, কবির মৌলিকতাও ক্ষুন্ন হয় নাই। পরন্তু, তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা ও সৃজনীশক্তিরূপ যাদুদণ্ডস্পর্শে বৈদেশিক উপকরণসমূহ নবশ্রীতে ভূষিত হইয়া এমনভাবে সজীব ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদিগকে আমরা বঙ্গসাহিত্যে কবির অভিনব দান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। এইসূত্রে বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্যপ্রভাব স্বীকৃত হইয়া আধুনিক যুগের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

"মেঘনাদবধ" কাব্যে বীর রস আছে, রৌদ্র রস আছে, অদ্ভুত ও করুণ রস আছে, স্বদেশপ্রীতি আছে। এক কথায় বলিতে গেলে এই কাব্যখানি বিচিত্র রস ও ভাবের আধার, ইহাতে সকল ভাবই কবি দক্ষ শিল্পীর ন্যায় প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

মাত্র চার-পাঁচ বৎসরকাল মধুসূদন বঙ্গভারতীর সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার স্পর্শে বাংলা কাব্যের যে রূপান্তর সাধিত হইল, তাহাতে মধুসূদন ও মধুসূদনের পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যের সহিত প্রাক্-মধুসূদনীয় যুগের বঙ্গসাহিত্যের ক্ষীণতম তুলনাও চলে না। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে তেমন বৈচিত্র্য ছিল না। সে সাহিত্য ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা-যন্ত্রের মত,- তাহাতে বৈচিত্র্যহীন একই রাগিণী উত্থিত হইত। কিন্তু মধুসূদনই সেই ক্ষীণধ্বনি একতারা যন্ত্রটিতে গম্ভীর ও মধুর সুরের নানা তার চড়াইয়া উহাকে সহস্রতন্ত্রী বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মধুসূদন কালগ্রাসে পতিত হন।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যে কয়জন কবি তাঁহাদের অমর প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন, হেমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। হেমচন্দ্র যখন বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হ'ন, তখন ইহার মধ্যে আসিয়াছে উন্মুক্ত সাগর ও আকাশের বিস্তৃতি; বিশ্বসাহিত্যের হাওয়া তখন বাংলার সাহিত্যজগতে প্রবাহিত হইতে সুরু করিয়াছে। হেমচন্দ্রের পূর্বে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদন আবির্ভূত হইয়া তাঁহার অলোকসামান্য সৃজনীপ্রতিভা দ্বারা কাব্য-নাটকের ক্ষেত্রে একটা নূতন যুগের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মধুসূদন সাহিত্যে যে নবীন আদর্শের অবতারণা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই উত্তরাধিকারী হইলেন হেমচন্দ্র। তাই মধুসূদনের লোকান্তর-গমনে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "মহাকবির সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখসাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্যনক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় মহাকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।" বাস্তবিকই মধুসূদনের বিয়োগে বাংলা সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছিল, হেমচন্দ্র তাহার খানিকটা পূরণ করিয়াছিলেন।

কবি হেমচন্দ্র ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গুলিটা গ্রামে

জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় ইঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ্. এ. পরীক্ষা পাশ করার পর অর্থাভাবে ইনি বিষয়কর্মে প্রবিষ্ট হইতে বাধ্য হ'ন, কিন্তু সে অবস্থায়ও তিনি বিদ্যাভ্যাসে বিরত হ'ন নাই। চাকুরী করিতে করিতেই তিনি বি. এ. ও বি. এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। অনন্তর কিছুদিন মুন্সেফী করিবার পর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, সাধুতা, বিচক্ষণতা ও কার্যকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়া তিনি বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছিলেন এবং বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া অর্থাভাবে তিনি নিদারুণ দুঃখ ভোগ করেন। হেমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "বৃত্রসংহার", "চিন্তাতরঙ্গিণী", "ছায়াময়ী", "দশমহাবিদ্যা", "বীরবাহু" ও "কবিতাবলী" সমধিক প্রসিদ্ধ।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার উন্মেষ হয়, তিনি তখন হইতেই কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। "চিন্তাতরঙ্গিণী" হেমচন্দ্রের প্রথম কবিতাপুস্তক। পুস্তকখানি হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশের সংগে সংগেই উহা জনসমাজে সমাদৃত হয়।

ইহার পর কবির "ভারত-সংগীত" প্রকাশিত হয়। স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি-প্রীতি এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা—এই তিনটি ভাবের উদ্দীপনাময় চিত্র হেমচন্দ্রের "ভারত-সংগীতে" বিদ্যমান। ভারতের অতীত মহিমাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়া ভারতকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দান করাই "ভারত-সংগীতে"র প্রধান উদ্দেশ্য। ভাষা ও ভাবের গৌরবে "ভারত-সংগীত" রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী। ইহার ভাষা, ছন্দ ও সুর একত্র হইয়া তূরীধ্বনির ন্যায় মনের মধ্যে এক অপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। "দশমহাবিদ্যা" কাব্য-খানি রচনা করিয়া হেমচন্দ্র ভক্তিরস উৎসারিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা ধর্মভাবমূলক উচ্চাঙ্গের গীতি-কবিতা। এই কাব্যের অন্তর্গত শিবের

বিলাপ অপূর্ব কবিত্ব-মণ্ডিত এবং ইহাতে কবির কল্পনার মৌলিকতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

হেমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য "বৃত্রসংহার"। মধুসূদনের "মেঘনাদবধ" কাব্যের মত ইহাও একখানি মহাকাব্য। মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্য-রচনার যে আদর্শ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাহাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মূল বিষয়বস্তুর ধারণা ও প্রকাশে তাঁহার প্রতিভা স্বতন্ত্র-রূপেও কার্য করিয়াছে। তাঁহার কাব্যের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গৌরব সর্বজনস্বীকৃত।

মহাভারতের বনপর্বে বৃত্রবধের উপাখ্যান আছে। মহাভারতোক্ত সেই কাহিনীকে কল্পনা-বলে সুসমৃদ্ধ করিয়া হেমচন্দ্র "বৃত্রসংহার" কাব্যখানি রচনা করেন। অতি প্রাচীন পৌরাণিক কালে শঙ্করের বরে বৃত্রাসুর অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী হয়। অতঃপর সে দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করে। তখন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা পাতালে গমন করেন, ইন্দ্রপত্নী শচী নৈমিষারণ্যে গমন করেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্র নিয়তির আরাধনায় কুমেরু পর্বতে সমাধিস্থ হ'ন। বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলা স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া ঐশ্বর্য-মদে মত্ত হইয়া শচীকে দাসী রূপে স্বর্গে আনয়ন করিলেন। বড় দুঃখ ও গ্লানির মধ্যে স্বর্গরাজ্যে শচীর জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ওদিকে ইন্দ্র নিয়তিকে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহার আদেশে শঙ্করের নিকট বৃত্র-বধের উপায় জানিতে গেলেন। শঙ্কর ইন্দ্রের প্রার্থনায় দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণ করিয়া বৃত্র-বধের উপায় ইন্দ্রকে বলিয়া দিলেন এবং শচীর অপমানে কুপিতা গৌরী বৃত্রাসুরের সৌভাগ্যলিপি খণ্ডন করিলেন।

দেব-দানবে পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত বজ্রে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিলেন। বৃত্রাসুরের পুত্র রুদ্রপীড়ও ইন্দ্রের শরজালে জর্জরিত হইয়া প্রাণ হারাইল। আর ঐশ্বর্য-মদমত্তা ঐন্দ্রিলার সকল দর্প চূর্ণ হওয়ায় তিনি হতাশায় উন্মত্ত হইয়া দেশে দেশে উন্মাদিনীর ন্যায় পর্যটন করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহাই "বৃত্রসংহারে'র সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান।

মহাভারতোক্ত এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কবিবর হেমচন্দ্র এক বিশাল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই কাব্যে চরিত্রসৃষ্টির কৌশল ঘটনাবলীকে জীবন্ত করিয়াছে, বীররসের উদ্দীপনায় সমগ্র কাব্যে অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। দধীচির আত্মত্যাগের বর্ণনায় পরহিতব্রতের অতুল মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। এই কাব্যে কবির আন্তরিক অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমও উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে "বৃত্রসংহার" কাব্যখানি আমাদের জাতীয় সাহিত্যের গৌরব।

হেমচন্দ্র গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছেন, মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনুবাদ-রচনাও অনেক। তাঁহার গীতিকবিতাগুলিতে স্থলে স্থলে কবির একান্ত ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতির অভিব্যক্তি হইয়াছে। মহাকাব্য-রচয়িতা হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব, কিন্তু গীতিকবিতা-রচনায় মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্র অধিকতর শক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার রচিত গীতিকবিতায় একটা নূতন সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—নিসর্গপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধের স্পর্শে তাহা সুন্দর। হেমচন্দ্র আর একখানি সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছেন- তাহার নাম "বীরবাহু কাব্য"। তিনি রাজনীতি-বিষয়ক কবিতা রচনা করিয়াছেন, ধর্মমূলক কবিতা রচনা করিয়াছেন, জন্মভূমির গৌরব কীর্তন করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। হাস্যরস ও ব্যঙ্গ-রস পরিবেশনেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে যে সকল কবি আমাদের জাতীয়ভাবের উদ্দীপনায় সহায়তা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে হেমচন্দ্র একজন প্রধান। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, বঙ্গভাষার প্রতিও তাঁহার অনুরাগের অন্ত ছিল না। স্বদেশপ্রীতি তাঁহার প্রায় সকল কাব্য ও কবিতার মূলগত ভাব—একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নূতন যুগের উপযোগী নূতন ভাবধারার পরিবেশন করিয়া তিনি বাঙ্গালীকে এক নূতন সঙ্গীত-রসের রসিক করিয়া তুলিয়াছিলেন। করুণ রসের কলগীতি শুনিতে শুনিতে বঙ্গবাসীর উদাস চিত্ত যখন ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে মধুসূদন ও হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে বীর ও রৌদ্ররসের মহাপ্লাবন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বীণাধ্বনি শ্রবণে অভ্যস্ত তন্দ্রালস

বাঙগালীর কর্ণে সহসা যেন সুগম্ভীর ভেরীনিনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল— ক্ষীণকায়া প্রবাহিনীর অবিরাম কুলুকুলুধ্বনি যেন মহাসাগরের তরঙ্গগর্জনের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

হেমচন্দ্র যেমন জলদ-গম্ভীর রবে ভেরী বাজাইয়া বাঙগালীর প্রাণ-মন মাতাইয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহার হাস্যরসপ্লাবিত কবিতাবলীতে নিরানন্দ এই দেশের অধিবাসী প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছে। করুণ রসের উদ্রেকেও তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল।

মধুসূদনের ন্যায় হেমচন্দ্রও কাব্যরচনায় দেশীয় ও বিদেশী সাহিত্য হইতে আখ্যায়িকা, ভাব, উপমা ইত্যাদি আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করেন। তাঁহার রচনার সরলতা এবং আবেগের ঐকান্তিকতা বাঙগালীর অন্তঃকরণকে এক সময়ে বিশেষভাবেই স্পর্শ করিয়াছিল। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র -পর পর এই দুই কবির আবির্ভাবে বাংলার সাহিত্যস্রোত এক নূতন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সে পথে বৈচিত্র্য অনেক, নূতনত্বও অনেক। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন যুগের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে এবং আধুনিক যুগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নবীনচন্দ্র সেন

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার সাহিত্য-জগতে কবি নবীনচন্দ্র সেনের আবির্ভাব হয়। ইউরোপীয় ভাব-ধারার প্রভাবে তখন বাংলার জাতীয় জীবনে একটা নূতন প্রেরণা আসিয়াছিল। তাহার স্পন্দন অনুভব করিয়া হেমচন্দ্রের মতই নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্য ও কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন। সেই যুগে জাতীয় জাগরণের সংগে সংগে স্বাদেশিকতার ভাবধারা দেশময় প্রবাহিত হইতেছিল। নবীনচন্দ্র তাহার দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারও সকল কাব্যের মূল কথা স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিপ্রীতি।

নবীনচন্দ্র বাংলা ১২৫৩ সালের মাঘ মাসে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'সরিৎ-মালিনী শৈলকিরীটিনী চট্টলা' তাঁহার ভাবুকতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাঁহার কবিপ্রতিভাকে একটা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন চট্টগ্রামের ক্রোড়ে অতিবাহিত হইয়াছিল। কবি এখানে চক্ষু মেলিয়া একদিকে দেখিতেন আকাশচুম্বী পর্বতমালা, অন্যদিকে দেখিতেন সীমাহীন সাগর। অন্তরাবেগে সে সাগর উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে, বিরামহীন আন্দোলনে ফুঁসিয়া গর্জিয়া উঠিতেছে, তরংগের পর তরংগ তুলিয়া খেয়াল-খুশিমত তীরের উপর ভাঙিয়া পড়িতেছে। চট্টগ্রামের পর্বতের এবং সমুদ্রের বিশালতা দিয়া গঠিত হইয়াছিল নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভা। তাই কাব্যের মধ্যে যে সকল চরিত্র তিনি অংকন করিয়াছেন সেগুলি মহিমায় ও

গরিমায় পর্বতের মত বিশাল। আর তাঁহার রচনার সর্বত্রই রহিয়াছে অশান্ত সমুদ্রের কলরোল। একটা দুর্বার আবেগ, একটা সজীব প্রাণস্পন্দন নবীন-চন্দ্রের কাব্যের বিশেষত্ব। কাব্যের ভিতর কবির এইরূপ প্রাণস্পন্দন অতি দুর্লভ বস্তু,—যথেষ্ট আন্তরিকতা ভিন্ন কবিতায় এইরূপ প্রাণস্পন্দন কখনও অনুভূত হয় না। নবীনচন্দ্রের কাব্য ও কবিতায় এই আন্তরিকতা ছিল—একটা স্বাভাবিক আবেগের তীব্রতা ছিল। তাই তাঁহাকে 'বাংলার বায়রণ' বলা হয়। ইংরাজ কবি বায়রণের কবিতার মত নবীনচন্দ্রের কবিতা আবেগ-ময়ী বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাঁহার কবিতা 'জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্যা'।

পাঠ্যাবস্থা হইতেই নবীনচন্দ্র কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অবকাশরঞ্জিনী"। কাব্যখানি কতকগুলি গীতিকবিতার সমষ্টি। নবীনচন্দ্রের গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য তাঁহার ভাষার পৌরুষে, তাঁহার শব্দচাতুর্যে শব্দের লালিত্যে ও মাধুর্যে। "অবকাশরঞ্জিনী"তে বিচিত্র ভাবের কবিতা আছে, কবির ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা, মিলনের আনন্দ ও বিচ্ছেদের ব্যথা—এ সকলই আছে। এই সকল চিন্তারাশির অন্তরালে কবির অকৃত্রিম দেশপ্রীতিও প্রায় সকল কবিতার মধ্য দিয়া বহমান।

"পলাশীর যুদ্ধ" কবির দ্বিতীয় কাব্য। এই কাব্যখানি রচনার সঙ্গে সঙ্গে নবীনচন্দ্রের খ্যাতি বহুবিস্তৃত হইয়া পড়ে। কাব্যখানি বাংলার রাজ-নৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের করুণ কাহিনী লইয়া রচিত। এজন্য সহজেই উহা বাঙ্গালীর অন্তর স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই কাব্যের মধ্যে কবির স্বদেশপ্রেম এবং অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির জন্য কবির আন্তরিক সহানুভূতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরাধীনতার গ্লানিতে পীড়িত কবির হৃদয়ের বাষ্পোচ্ছ্বাস বারংবার এই কাব্যে দেখা যায়।

পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস।

—ইহা শুধু কবিরই ব্যক্তিগত কথা নয়। পরাধীন বাঙ্গালী জাতি এই কাব্যে তাহার মর্মবাণী খুঁজিয়া পাইয়াছিল বলিয়াই "পলাশীর যুদ্ধ" অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

"পলাশীর যুদ্ধ" ঐতিহাসিক কাব্য। ইতিহাসে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের যে মর্ম্মন্তুদ কাহিনী আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কাব্যখানি রচিত। ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে বিচরণ করিয়া কবি এই কাব্যে তাঁহাব সুগভীর জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়াছেন। সিরাজের সেনাপতি মোহনলালের চরিত্রে যে তীব্র জাতীয়তাবোধ ও বলিষ্ঠ পৌরুষ রহিয়াছে, তাহা সমগ্র কাব্যখানিকে মহনীয় করিয়াছে। যুদ্ধাবসানে যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু মোহনলালের খেদোক্তির মধ্যে বাংলার- তথা সমগ্র ভারতের মর্ম-বিদারী ক্রন্দন রোল ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। দিবাবসান হইবামাত্র বঙ্গদেশ ইংরাজের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে একথা উপলব্ধি করিয়া মোহনলাল বিলাপ করিতেছেন—

কোথা যাও ফিরে চাও সহস্রকিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে যবন-ভাগ্যে বিষাদ রজনী!
এ বিষাদ অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে
ডুবায়ে যবন-রাজ্যে যেয়ো না তপন!
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ করে,
কি দশা দেখিয়া, আহা! ডুবিছ এখন?
পূর্ণ না হইতে তব অর্ধ আবর্তন,
অর্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমনে!

এইরূপ দেশানুরাগের সুরে কাব্যখানির আদ্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে।

দেশানুরাগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কাব্য হিসাবে "পলাশীর যুদ্ধ" অনবদ্য সৃষ্টি। কল্পনার লীলা-বিলাসে, ছন্দের মাধুর্যে ও গাম্ভীর্যে, বাঙালীর মর্মকথা প্রকাশে "পলাশীর যুদ্ধে"র জুড়ি মেলা ভার। কাব্যখানির ভাষা একদিকে অগ্ন্যুদ্গারের মত তীব্র ও উগ্র,—উহা আমাদিগকে মাতাইয়া তুলে, পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত করে।

অপরদিকে এ কাব্যের ভাষা অতি করুণ, অতি মর্মস্পর্শী। এই কাব্যে কবি-বর্ণিত "ব্রিটিশের রণবাদ্য" ভুলিবার নহে। পলাশীর রণস্থল ও বিজয়ীর জয়োল্লাস নবীনচন্দ্র বিশেষ পটুতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। আবার মোহনলালের করুণ বিলাপও তিনি সমান দক্ষতার সহিতই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"পলাশীর যুদ্ধে"র পরে কবি তাঁহার "রঙ্গমতী" কাব্যখানি রচনা করেন। "রঙ্গমতী"র মধ্যে কবির দেশপ্রীতি উচ্ছল হইয়া রহিয়াছে। কল্পনার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দেশের অধ্যাত্মভাবকে জাগাইয়া তুলিয়া একটা বিরাট ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়িবার অভিলাষ নবীনচন্দ্র এই কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই হিসাবে এই কাব্যখানি একাধারে স্বাধীনতা ও ধর্মভাবমূলক কাব্য। শ্রীকৃষ্ণের জীবন যে কবির ভবিষ্যৎ কাব্য-রচনার উপাদান হইবে, তাহার আভাস এই কাব্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। হয়তো এই সময় হইতেই কবি সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে সুরু করিয়াছিলেন—কোন্ মহাপুরুষ এই "খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত"কে এক মহাধর্মরাজ্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে গিরিব্রজপুরে মহাভারত পাঠ করিবার সময়ে কবির মানসনয়নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরাট উজ্জ্বল মূর্তি। সেই বরেণ্য মূর্তিকে মর্মকেন্দ্রে রাখিয়া কবি তাঁহার "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" কাব্যত্রয় রচনা করিলেন।

"পলাশীর যুদ্ধ" রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কবি দেখিয়াছিলেন, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মবিরোধ ভারতের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে। কবি তাঁহার দূরদৃষ্টিতে অতীত ভারতের সমস্ত ঐতিহাসিক রণক্ষেত্র খুঁজিয়াও দেখিলেন—সেই একই শোচনীয় কাহিনী। সেই ভ্রাতৃদ্রোহ ও গৃহবিবাদ,—সেই স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু মহাভারতের অলৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যে তিনি লক্ষ্য করিলেন মহিমান্বিত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে - যিনি আত্মকলহ এবং অন্তর্বিদ্বেষে খণ্ডিত ভারতবর্ষকে অবনতি ও ধ্বংসের মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া এক অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ ধর্মরাজ্য সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সুতরাং জাতীয় ভাবের ভাবুক কবি নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সেই বরেণ্য মূর্তিকে সম্মুখে রাখিয়া কাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রচিত

হইল "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" কাব্যত্রয়। এই তিনখানি কাব্য মিলিয়াই গড়িয়া উঠিল ঊনবিংশ শতাব্দীর নবীন মহাভারত।

এই কাব্য তিনখানিতে নবীনচন্দ্র পুরাণকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াও কাব্যমধ্যে মানবরূপে মানবত্বের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া আরতি করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ মানুষ হইতে বহু দূরে অবস্থিত বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ নহেন, তিনি আদর্শ পুরুষ, লোকহিত-ব্রতই তাঁহার জীবনের মূল কথা, তাহাই তাঁহার জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। তাঁহার মধ্যে দয়া, প্রেম, শৌর্য, জ্ঞান, ভক্তি, রুদ্রভাব ও কমনীয়তা সকলই বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকল্পিত বিশাল ধর্মসাম্রাজ্যকেই কবি বলিয়াছেন 'মহাভারত'। সে ভারতে দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, হিংসা, কলহ থাকিবে না; থাকিবে ঐক্য ও মৈত্রী; সেখানে সকলেই ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সুখে বাস করিবে। শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা করিয়াছেন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন। কোন্ পথে, কি ভাবে চালিত হইলে ভারতের পূর্ব জ্ঞানগরিমা, পূর্বেকার বীর্য-ঐশ্বর্য, পূর্বেকার ঋদ্ধি-সিদ্ধি ফিরিয়া আসিবে, কোন্ পথে চালিত হইলে ভারত-সভ্যতার অমৃতরূপ আবার ফুটিয়া উঠিবে, ভারত 'মহাভারতে' মহাধর্মসাম্রাজ্যে—পরিণত হইবে, কবি তাঁহার অঙ্কিত কৃষ্ণচরিত্রে তাহার পরিস্ফুট ইঙ্গিত দান করিয়া গিয়াছেন। "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" কাব্যের শ্রীকৃষ্ণ কবি নবীনচন্দ্রের এক অতুলনীয় সৃষ্টি। তিনি দেশকালের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়া বিশ্বসংসারকে এক আদর্শ ধর্মসাম্রাজ্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। সে সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র, আর্য অনার্য, উচ্চ নীচের কোন ভেদ নাই- জাতি ও দেশের সংকীর্ণতা এক মহান্ সার্বজনীন ভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ নিরূপণ করিতে যাইয়া কবি মহামুনি বেদব্যাসের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

—কর দরশন!
সর্বত্র ধর্মের গ্লানি, অধর্ম প্রবল,—
সাধুদের হাহাকার, দুষ্কৃত দুর্জন
বর্ষিতেছে নিরন্তর পাপ হলাহল।

অধর্মের অভ্যুত্থান, এই পাপভার
করিতে মোচন, বৎস! করিতে প্রচার
মহারাজ্য ধর্মরাজ্য, করিতে প্রচার
ভারতে মহাভারত; কৃষ্ণ অবতার।
অপূর্ব জীবনলীলা!—

এই শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়াছেন ভারতবর্ষকে -

বাঁধি ধর্ম নীতিপাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদ জ্ঞান করিব রহিত।
শিখাব একত্ব মর্ম, -
এক জাতি, এক ধর্ম,
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ।

কাব্যের সর্বত্রই এই বিরাট পুরুষ পুণ্য ভারতভূমিতে এক ধর্ম, এক জাতি, এক রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী হইয়া এক উচ্চ আদর্শের মহতী বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন--

ফলাফল নারায়ণ-পদে সমর্পিয়া
এই কর্তব্যের স্রোতে যাইব ভাসিয়া।
এক ধর্ম, এক জাতি,
এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি সর্বভূতহিত:
সাধনা নিষ্কাম ধর্ম,
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,
একমেবাদ্বিতীয়ম্!—করিব নিশ্চিত
ওই ধর্মরাজ্য 'মহাভারত' স্থাপিত!

নবীনচন্দ্রের "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাসে" যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি, কল্পনার যে বিচিত্র প্রকাশ রহিয়াছে, তাহার জন্য বাংলার কাব্যসাহিত্যে তাঁহার স্থান চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নবীনচন্দ্র কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত সাম্যের মহিমা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন নাই, তিনি বুদ্ধদেবের সাম্যবাদের চারুচিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার "অমিতাভ" কাব্যে। তিনি মহাপুরুষ খৃষ্টকে এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে লইয়াও যথাক্রমে তাঁহার "খৃষ্ট" ও "অমৃতাভ" কাব্য দুইখানি রচনা করেন। "অমিতাভে" কবি গাহিয়াছেন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের জীবন-মহিমা, "খৃষ্টে" মর্তলোকে স্বর্গরাজ্যপ্রতিষ্ঠাকারী যিশুখৃষ্টের জীবনগাথা, আর "অমৃতাভে" প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী, তাঁহার প্রেমের মহিমা।

বিশ্বমানবের পরিপূর্ণ কল্যাণসাধনই ছিল নবীনচন্দ্রের জীবনের আদর্শ। সেইজন্যই বুদ্ধদেবের কল্যাণময় মূর্তি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার "অমিতাভ" কাব্যে ভগবান্ বুদ্ধের মৈত্রী-করুণায় দ্রবীভূত কল্যাণময় মূর্তিটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি সকল অবতারকেই কবি যতটা পারেন প্রীতির বন্ধনে মানুষের আত্মীয় করিয়া, মানুষের সহিত ইঁহাদের অন্তরঙ্গ যোগটি প্রধান করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। মানুষকেই তিনি দেবতা করিয়াছেন, দেবতাকে মানুষ করেন নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য মানুষের মহিমাপ্রকাশক সাহিত্য। নবীনচন্দ্র মানুষের মহিমাখ্যাপক কবি। বিশ্বপ্রীতিতে তাঁহার অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। তাই তিনি তাঁহার সকল কাব্যেই মনুষ্যত্বের অমর মহিমার জয়গান করিয়া গিয়াছেন। যে বিশ্বপ্রেম এবং মানবপ্রীতি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শতধারায় উৎসারিত হইয়াছিল, নবীনচন্দ্রে তাহারই বিকাশ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও মানবসমাজের উন্নতির জন্য এইরূপ একটা কল্যাণী ইচ্ছা ছিল। তাই তিনিও রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্র"। বঙ্কিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মধ্য দিয়া এই বিশ্বপ্রেম বা মানবপ্রীতি রবীন্দ্রনাথে পূর্ণবিকাশ লাভ করে।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়েই বাংলার জাতীয় কবি। উভয়ের পার্থক্য এই যে, হেমচন্দ্রের কবিতায় কেবল স্বাদেশিকতা, কিন্তু নবীনচন্দ্রের কবিতা স্বদেশ-প্রীতির সীমা পার হইয়া পরবর্তী কবি রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া শাশ্বত মানবজীবন ও বিশ্বজীবনকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি হেমচন্দ্র অপেক্ষা আরও ব্যাপক, আরও গভীর, আরও সুদূরপ্রসারী।

কিন্তু শুধু কল্পনামাধুর্য অথবা ধর্মান্ধতাবর্জিত উদার মনোভাবের জন্য নবীনচন্দ্রের প্রশংসা নয়, কাব্য ও কবিতার মধ্য দিয়া একটা সংগীতধ্বনি অনুরণিত করিয়া তোলার জন্যও নবীনচন্দ্র অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয় ছন্দের সাহায্যে কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং উভয় ছন্দেই তিনি তাঁহার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যখানির অন্তর্গত মিত্রচ্ছন্দ পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করিবে। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দও ধ্বনিবৈচিত্র্যে সার্থক হইয়াছে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের গতি ও তরঙ্গ দুইই নবীনচন্দ্রে অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়।

নবীনচন্দ্র যে যুগে আবির্ভূত হন, সেই যুগের কবিমাত্রের মধ্যেই একটা মহাকাব্যপ্রীতি জাগিয়াছিল। এই যুগের কবিগণের অধিকাংশই মহাকাব্য-রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই ইতিহাস অথবা পুরাণ হইতে উপকরণ আহরণ করিয়া কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। নবীনচন্দ্রও এই যুগ-ধর্ম অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনিও ইতিহাস, পুরাণ হইতে তাঁহার কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনিও মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস"—এই কাব্যত্রয় মহাকাব্য। কিন্তু গুণই হউক বা দোষই হউক, নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের এক বৈশিষ্ট্য উহার গীতি-প্রাণতায়,—নিজ ব্যক্তিগত ভাবনিবেদনে। কেবল আকার বা গঠনরীতির দিক দিয়া নবীনচন্দ্রের কাব্য বিচার করিলে চলিবে না।

নবীনচন্দ্র গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, নূতন যুগের উপযোগী মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, কাব্যের মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতির, সাম্যের ও ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন, আশ্চর্য প্রাণস্পন্দে ছন্দকে সঞ্জীবিত

করিয়াছেন। এই সকল বিচিত্র সৃষ্টির জন্য এই যুগের কবিদিগের মধ্যে মধুসূদনের পরে নবীনচন্দ্রের নামই করিতে হয়। বাংলা কাব্যের মধ্যে নূতন সামর্থ্য ও সমৃদ্ধি, নূতন কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি আনার জন্য বঙ্গসাহিত্যে তিনি অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ

"জগৎ কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব;
বাঙালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব।"

—এ কথা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে। জগতেব কবিসভায় রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট আসন নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মত বহুমুখী প্রতিভার কবি জগতের সাহিত্যেও বিরল। ইংরাজী

সাহিত্যে সেক্সপীয়ারের প্রতিভা, ফরাসী সাহিত্যে ভিক্টর হুগোর প্রতিভা এবং জার্মান সাহিত্যে গ্যেটের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী। ভারতবর্ষের বহু শত বৎসরের তপস্যার ফল রবীন্দ্রনাথ। তাঁহাকে পাইয়া বাংলা ও বাঙ্গালী সমগ্র জগতের কাছে গৌরবান্বিত।

রবীন্দ্র-কাব্যের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র বিশ্বে অসংখ্য। জগতের সকল স্থানেই কবির অগণিত ভক্ত আছে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "বুদাপেস্ট শহরের কথা আমার মনে পড়ে। একদিন একটি হাসপাতালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে ভারতীয় দেখে অনেক রোগীই তাদের বালিশের নীচ থেকে হাঙ্গেরীয় ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কাব্য-নাটকের খণ্ড বা'র করে দেখিয়ে বলেছিল- আমরা টেগোরের গ্রন্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি। এ আমাদের দুঃখে সান্ত্বনা, রোগযন্ত্রণায় স্বস্তি এনে দেয়।" শ্রীযুক্তা নাইডু আরও বলিয়াছেন, "একসময়ে সুইডেনে শীতঋতু যাপন করি। সেখানেও সকলে আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা শুনতে চাইত। নরওয়ে ভ্রমণকালে লক্ষ্য করেছিলাম যে, সেখানকার তুষারাস্তীর্ণ পর্বতগাত্রে কৃষকদিগের পরস্পর বিচ্ছিন্ন নিরালা আবাসে কুয়াসামলিন শীতঋতুতে কৃষক পরিবার রবীন্দ্রনাথের কাব্য অথবা নাটক পাঠ করছে আগুনের চারিদিকে বসে। এ ছাড়া ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালী যখনই যেখানে গিয়েছি সেখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা দেখেছি। পূর্ব আফ্রিকার অসভ্য জাতিরাও জানে যে রবীন্দ্রনাথ নামে একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি আছেন।"

বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের মত এত মর্যাদা পৃথিবীর আর কোন কবি জীবৎকালে লাভ করেন নাই। তাঁহার এই মর্যাদায় বাংলার, তথা ভারতের মর্যাদা বিশ্বের কাছে বহুগুণে বাড়িয়াছে। একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, জগতে কোন সম্রাট্, কোন রাষ্ট্রনেতা, কোন পণ্ডিত, কোন সাহিত্যিক বা কোন দিগ্‌বিজয়ী বীর জীবদ্দশায় তাঁহার মত এমন শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী হ'ন নাই।

কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জন্ম হয় ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ তারিখে।

ঠাকুর পরিবার জ্ঞানে, বিদ্যায়, অর্থে, সংস্কৃতিতে ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ধর্মে ও কর্মে, ত্যাগে ও ভোগে, কলায় ও বিদ্যায় ঠাকুর পরিবারের একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য ছিল। এই পরিবারের শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবেষ্টনী ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। এই বাড়ীর বিশ্ববিদ্যালয়েই কবির বাল্য-কৈশোরের শিক্ষা।

বিদ্যালয়ের জীবন রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃসহ ছিল। তাঁহার মন ছিল মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়। সেখানকার প্রাচীরের কারা তাঁহার কল্পনাপ্রবণ স্বাধীন কবিমানসকে পীড়িত করিত। সেইজন্য স্কুল-কলেজের বাঁধা শিক্ষা তাঁহাকে কোনদিন আকৃষ্ট করে নাই। কিন্তু শিক্ষার প্রতি তিনি কোনদিনই উদাসীন ছিলেন না। নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া তিনি বাড়ীতে অল্প বয়সেই অনেক বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন কবিতা-আবৃত্তি, নাট্যাভিনয়, কাব্য ও সাহিত্যের সমালোচনা প্রভৃতি তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই হইত। এই বাড়ীর চারিপাশে ছিল শিল্প-সাহিত্যের, শিক্ষার ও আনন্দের এক পরিবেষ্টনী। পরবর্তী জীবনেও নানা উপায়ে নানা দিক হইতে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছিল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞানানুশীলন কিছুমাত্র কমে নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিলেও তাঁহাব মত বহুবিদ্য ব্যক্তি জগতের যে কোন দেশে বিরল।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষালাভের বিশিষ্টতাও লক্ষণীয়। তিনি জ্ঞান আহরণ করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। তাঁহার অধীত বিদ্যাকে এবং নব-লব্ধ চিন্তারাশিকে বাণীরূপ দান করিয়া তিনি কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার সকল রচনাই মার্জিত বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর এবং অসামান্য সৌন্দর্যবোধের রসে শুচিশ্রীসম্পন্ন।

রবীন্দ্রনাথ ধনী পরিবারে জন্মিয়াছিলেন। সেকালে ধনী বলিয়া ঠাকুর পরিবারের খ্যাতিও সমস্ত বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু তবু এ পরিবারের

ছেলেদের চালচলনে কোনরূপ ধনগর্ব একদিনের জন্যও ফুটিয়া উঠে নাই। সেইজন্য দেখা যায় যে, সরল, অনাড়ম্বর ভাবে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। রেড়ির তেলের আলোতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার বালক-বয়সে পড়িতে হইত। বিজলী বাতি ত দূরের কথা, কেরোসিনের বাতিও তাঁহার অদৃষ্টে জুটে নাই। আহারেও তাঁহার কোনপ্রকার বিলাসিতা ছিল না। তাঁহার পরিধেয় বেশভূষা ছিল সাধারণ ধরণের। বয়স দশের কোঠা পার হইবার আগে রবীন্দ্রনাথ মোজা পরিতে পান নাই। বালক রবীন্দ্রনাথকে শীতকালে দু'টি মাত্র সাদা জামা গায়ে দিয়া কাটাইতে হইত। শীত বলিয়া দুইটি। গরমের দিনে একটি সাদা জামাই কবির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছেলেবেলায় তিনি বাড়ীতে পরিবার জন্য বৎসরে মাত্র একজোড়া চটি পাইতেন।

ঠাকুর পরিবারে ছেলেদের দেখাশোনার ভার ছিল ভৃত্যদের উপরে। চাকরদের শাসন ছিল কঠোর। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বলিয়াছেন "ভৃত্যরাজকতন্ত্র"।

শ্যাম নামে একটি চাকরের উপর রবীন্দ্রনাথের দেখাশোনার ভার ছিল। এই চাকরটি ছিল কিছু আরামপ্রিয়, আর চতুর। পাছে বালক রবীন্দ্রনাথ তাহার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করেন, সেজন্য সে এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাকে এক জায়গায় বন্দী করিয়া রাখিত। রবীন্দ্রনাথকে সে ঘরের একটা নির্দিষ্ট কোণে বসাইয়া তাঁহার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। তাহার পর মুখ গম্ভীর করিয়া বালককে সাবধান করিয়া বলিত, "এই গণ্ডির ভিতর ব'সে থাক। খবরদার, বাইরে এসো না। গণ্ডির বাইরে এলেই বিপদ।" বিপদটা কি, তাহা বালক রবীন্দ্রনাথ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু তবু তাঁহার মনে বড় আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতা দেবীর কি সর্বনাশ হইয়াছিল, তাহা তিনি রামায়ণে পড়িয়াছিলেন। তাই তিনি ভাবিতেন, গণ্ডিটাকে অগ্রাহ্য করিলে হয়ত রাবণের মত কেহ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। এই আশঙ্কায়, যতক্ষণ শ্যাম আসিয়া তাঁহাকে বাহিরে না আনিত, ততক্ষণ চুপ করিয়া তিনি ঐ গণ্ডির মধ্যে বসিয়া জানালার বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির শোভা দেখিতেন।

জানালার নীচেই একটি পুকুর ছিল। পুকুরে লোকেরা স্নান করিতে আসিত, হাঁসেরা সাঁতার কাটিত, নারিকেল গাছগুলি তাহাদের পাতার ঝালর দোলাইত। এই দৃশ্য কবির কল্পনাকে দোলা দিয়া যাইত, বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্য ও সৌন্দর্যরাশি কবিকে তন্ময় করিয়া তুলিত। শ্যামের দেওয়া গণ্ডিটাকে উপেক্ষা করিয়া বালক রবীন্দ্রনাথের বাহিরে যাওয়ার উপায় ছিল না বটে, কিন্তু বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির রূপশ্রী দরজা-জানালার কাচ ভেদ করিয়া কবির অন্তরে প্রবেশ করিত। তাঁহার ইচ্ছা হইত গৃহের বন্দিশালা হইতে অনন্ত-প্রসারিত বহির্জগতে ছুটিয়া বাহির হইতে। কিন্তু বাহির হওয়ার উপায় ছিল না বলিয়াই তিনি নির্নিমেষ নেত্রে প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য দেখিতেন, আর কল্পনার রঙে তাঁহার পিপাসু মন রঙীন হইয়া উঠিত। এইরূপে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত পরিচয়ের মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথের চিত্তে কবিপ্রতিভা অংকুরিত হইয়াছিল।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিবিড় পরিচয় এবং পারিবারিক প্রভাব- এই দুইয়ে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের চিত্তে কবিত্বের উন্মেষ ঘটাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা, তাঁহার অগ্রজেরা, বস্তুতঃ পরিবারের সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কাব্যের প্রতিও তাঁহাদের অনুরাগ ছিল অসীম। ইঁহাদের বাড়ীতে সর্বদা কাব্যপাঠ ও কাব্যালোচনা হইত, সংগীতচর্চা হইত। বালক রবীন্দ্রনাথ সংগীতচর্চা করিতেন, বাড়ীর সকলের দেখাদেখি কবিতা রচনা করিতেও চেষ্টা করিতেন।

কবি যখন বালক, তখন তাঁহার বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা রচনা করিতেন। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন একেবারে শ্রাবণের প্লাবন--নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল-উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। বালক রবীন্দ্রনাথ সব সময় সেই সব কবিতার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু সেই সাহিত্যরসস্রোতে মনের সাধ মিটাইয়া সন্তরণ করিতেন, তাহারই আনন্দ-আঘাতে কবির শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

বালক রবীন্দ্রনাথকে প্রথম কবিতা লিখিতে শিখান তাঁহার এক ভাগিনেয়। ইনি কবির চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন—ইঁহার নাম জ্যোতিঃপ্রকাশ। জ্যোতিঃপ্রকাশের কাছে চৌদ্দ অক্ষর মিলাইয়া কবিতা রচনার প্রথম পাঠ শিখিয়া ইনি বাড়ীর অন্যান্য সকলের মত কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার

কবিতা রচনার প্রথম উৎসাহ সম্বন্ধে কবি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, "হরিণ শিশুর শিঙ্ বাহির হইবার সময়ে সে যেমন যেখানে-সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্‌গম লইয়া আমিও সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম।" হাতের কাছে কাগজের টুকরা পাইলেই বালক রবীন্দ্রনাথ তাহাতে কবিতা রচনা করিয়া বসিতেন।

ইহার পর বাড়ীর এক কর্মচারীর নিকট হইতে তিনি একখানি নীল কাগজের খাতা চাহিয়া লইয়া বহু কবিতা রচনা করিয়া খাতাখানি ভরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন কবির বয়স মাত্র আট বৎসর। কবির বয়স যখন ১৪ বৎসর (১২৮২ সাল) তখন "জ্ঞানাঙ্কুর" নামক একখানি সাময়িক পত্রিকায় "বনফুল" নামে তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। ইহার পরে ১২৮৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "ভারতী" নামক বিখ্যাত পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। "ভারতী" প্রকাশের প্রথম বৎসর হইতেই ঐ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, সমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম বৎসরের "ভারতী" কবির বহু রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছিল—কবির বয়স তখন মাত্র ১৬ বৎসর। এই বয়সেই তিনি "কবিকাহিনী", "ভগ্নহৃদয়" ও "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" নামক কাব্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রতিভা-নির্ঝরিণী শতদিকে শতমুখে প্রবাহিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নব নব উন্মেষশালিনী। কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রহসন, প্রবন্ধ, সমালোচনা—যেদিকেই কবি তাঁহার প্রতিভাজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছেন, সেই দিক্‌টিই সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি-কল্পনাকে তিনি নিত্য নব নব বাণীরূপে দান করিয়াছেন—তিনি নিজের সৃষ্টিকে নিজেই অতিক্রম করিয়া নূতন নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন, নূতন রূপ সৃষ্টি করিতে মৃত্যুকাল পর্যন্তও বিরত হন নাই। কবি নব নব ছন্দেরও প্রবর্তন করিয়াছেন—তাঁহার বাগ্‌বৈভবে ও প্রকাশভঙ্গিমায় বাংলা সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হইয়াছে।

"সন্ধ্যাসঙ্গীত" নামক কাব্য রবীন্দ্রনাথের কুড়ি বৎসর বয়সের রচনা। অতঃপর "প্রভাতসঙ্গীত" নামক কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাঁহার

বাইশ বৎসর বয়সে। এই কাব্যে কবি আপন প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। "সন্ধ্যাসঙ্গীতে" একটা বিষাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে—প্রকৃতির পরিচয় লাভ করিতে না পারায় কবির প্রাণ এই কাব্যে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। "প্রভাতসঙ্গীতে" বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির নিবিড় পরিচয় ঘটিয়াছে। এই কাব্যে এই নিবিড় পরিচয়ের—এই মিলনের আনন্দই অভিব্যক্ত হইয়াছে। "প্রভাতসঙ্গীতে"র বহু কবিতায় দেখা যায়—কবির ভাবজীবন যেন অকস্মাৎ উৎসাহিত হইয়া প্রবলবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাই কবি গাহিয়াছেন—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি':
জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি।"

অকস্মাৎ বিশ্বপ্রকৃতির অসীম রহস্য উপলব্ধি করায় কবির উল্লাস প্রকাশিত হইয়াছে।

"প্রভাতসঙ্গীত" রচনার পর হইতে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত যত কাব্য রচনা করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে কবির কল্পনা স্বাভাবিক ভাবেই আপন পথ করিয়া লইয়া দিকে দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। "ছবি ও গান", "কড়ি ও কোমল", "মানসী", "সোনার তরী", "চিত্রা", "চৈতালি", "কথা", "কাহিনী", "কল্পনা", "কণিকা", "ক্ষণিকা", "নৈবেদ্য", "শিশু", "উৎসর্গ", "খেয়া", "গীতাঞ্জলি", "বলাকা", "পূরবী", "মহুয়া", "বনবাণী", "পুনশ্চ", "পরিশেষ" প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। প্রত্যেক কাব্যে কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও চিন্তাধারার একটি বিশিষ্টতা দেখা যায়। সংক্ষেপে রবীন্দ্র-কাব্যের কয়েকখানির ভাব ও কল্পনা-বিলাস এখানে বিশ্লেষিত হইল।

"কড়ি ও কোমলে" প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ লইয়া এবং মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন-স্নেহ-প্রেম লইয়া কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে, এই ধরণীকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য কবি গাহিয়াছেন—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

কবির কাছে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানব দুইই সমান প্রিয়। শিশু সম্বন্ধে কবিতা-রচনায় কবির যে কৃতিত্ব পরবর্তীকালে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার অংকুর দেখিতে পাওয়া যায় "কড়ি ও কোমল" কাব্যে। কবির স্বদেশপ্রেমের প্রথম উন্মেষও এই কাব্যে। এই হিসাবে কাব্যখানি রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

"কড়ি ও কোমলে"র পর রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। "মানসী"তে কবির বিচিত্র রচনাভংগী লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই কাব্যে কবির প্রতিভা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, কবির চিন্তাশক্তি সুপরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাতে তিনি স্বদেশের সংস্কৃতিধারাকে অপূর্ব বাণীরূপ দান করিয়াছেন। "মানসী"র অপর বিশিষ্টতা ইহার ছন্দোবৈচিত্র্যে। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-ভাব ও ছন্দোধারার সার্থক পরীক্ষাশালা এই "মানসী" কাব্য।

"মানসী"র পরে "সোনার তরী"। রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যে "সোনার তরী" একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই কাব্যের প্রথম কবিতা "সোনার তরী"--সেই অনুসারেই কাব্যের নামকরণ হয়। "সোনার তরী"র পরে কবি "চিত্রা" ও "চৈতালি" কাব্য রচনা করিয়াছেন। "চিত্রা" কাব্যের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে কবির সৌন্দর্যানুভূতি বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল কাব্যই কল্পনার গভীরতায়, ভাষার পারিপাট্যে ও ছন্দোবৈচিত্র্যে অপূর্ব।

"চৈতালি"র পর "কথা" এবং "কাহিনী" নামক কাব্য দুইখানি প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি কাব্যের প্রায় সকল আখ্যায়িকার মূলে আছে ভারতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ। বৌদ্ধ, শিখ, মহারাষ্ট্র ও রাজপুত জীবনের এবং বাংলার সামাজিক জীবনের ত্যাগের কাহিনী অবলম্বন করিয়া অধিকাংশ কবিতা রচিত হইয়াছে। এই জন্য "কথা" ও "কাহিনী"র প্রত্যেকটি কবিতার মধ্য দিয়া এক একটি মহান্ আদর্শ, আত্মত্যাগের এক একটি উজ্জ্বল নিদর্শন রসরূপ লাভ করিয়াছে।

"কথা" ও "কাহিনী" রচনার কয়েক বৎসর পরেই রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা" কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। "সন্ধ্যাসংগীতে" কবি তাঁহার প্রতিভার সন্ধান পাইয়াছিলেন। "ক্ষণিকা" কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব ভাষার সন্ধান

পাইয়াছেন এবং ছন্দের উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গীতি-কবিতার রসসৃষ্টির প্রধান উপাদান—ছন্দ, সহজ ভাষা ও সহজ অলঙ্কার। "ক্ষণিকা" কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে এসকলের চূড়ান্ত উৎকর্ষ দেখা যায়। ভাষার মধুরতায়, ছন্দোঝঙ্কারে ও অলঙ্কারের চাতুর্যে "ক্ষণিকা"র প্রত্যেকটি কবিতাই কবির অপূর্ব সৃষ্টি।

"ক্ষণিকা"র পরেই "নৈবেদ্য"। "নৈবেদ্য" কবির এক অভিনব রচনা। "নৈবেদ্য"র অধিকাংশ কবিতাতেই আধ্যাত্মিক ভাব বর্তমান। কয়েকটি কবিতায় কবির স্বদেশপ্রীতিও আবেগের সহিত ব্যক্ত হইয়াছে। এই কাব্যে সাধক রবীন্দ্রনাথ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন পূর্ণ মনুষ্যত্ব -নিজের জন্য ও স্বদেশবাসীর জন্য। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে ও ধর্মের পথে চলিতে গেলে অশেষ দুঃখ হয়ত আমাদিগকে পাইতে হইবে কবি ইহা জানেন। অথচ সেই সত্য, ন্যায় ও ধর্মের প্রতি কবির গভীর অনুরক্তি। সেইজন্য তিনি দুঃখ বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া দুঃখ বহন করিবার শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন পরমেশ্বরের নিকট। এই কাব্যে প্রাচীন ভারতের মহনীয় সংস্কৃতির অপূর্ব বন্দনা দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের শিশুসম্বন্ধীয় কবিতারচনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় "কড়ি ও কোমল" কাব্যে। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার এই দিকটি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে "শিশু" কাব্যে। "শিশু"র কবিতাসমূহ কল্পনাপ্রবণ শিশু-হৃদয়ের আলেখ্য। কবি শিশু-চিত্তের অন্তর্নিহিত রহস্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে সরসসুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এই কাব্যে। নিজে শিশুভাবে আবিষ্ট হইয়া শিশুর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া রচিত এরূপ চমৎকার কাব্য জগতে দুর্লভ।

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর কাব্য আছে, যাহা কোনও বিশেষ দেশের বা কালের নহে। সেই সকল কবিতা সার্বজনীন ও সার্বভৌম, স্থান-কালকে অতিক্রম করিয়া সর্বত্র ও সর্বকালে তাহাদের সমাদর। রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" এই শ্রেণীর কাব্য। এই কাব্যের সার্বজনীনতা (Universalism) উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্ত্য জগৎ মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দান করিয়াছিল।

ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" পুস্তকের দ্বারাই সমগ্র ইউরোপে রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। "গীতাঞ্জলি"র কবিতাগুলির মধ্যে একদিকে আছে কবির আধ্যাত্মিক সাধনার উপলব্ধি, অপরদিকে দেশের দুর্দশায় বেদনাবোধ। ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" কিন্তু বাংলা "গীতাঞ্জলি"র ঠিক অনুবাদ নয়, ইহাতে কবির রচিত অপরাপর কাব্য হইতেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

"গীতাঞ্জলি"র পরে "বলাকা"। নানাদিক হইতে "বলাকা" কাব্য রবীন্দ্র-নাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম। ইহার ছন্দের মধ্যে নূতনত্ব আছে, ইহার ভাবও অভিনব।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল কাব্যের মধ্যেই একটা গতির আবেগ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিতে চাহিয়া উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"যাত্রী আমি ওরে,
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধ'রে।"

কবি বলিতে চাহিয়াছেন - স্থাণুত্বই স্থবিরতা -এমন কি মৃত্যু; গতিই জীবন। গতির গীতিই জীবনের গীতি যৌবনের গীতি।

"বলাকা"র প্রত্যেক কবিতায় এই গতির প্রবাহ খুব স্পষ্ট। ইহার প্রত্যেকটি কবিতা 'অকারণ অবারণ চলা'র আহ্বানে পরিপূর্ণ। কবি আকৈশোর অনুভব করিয়াছেন যে গতির মধ্য দিয়াই বিশ্বের প্রাণশক্তি বিকাশ পায়। সেইজন্য কবি ক্রমাগত সীমার বন্ধন হইতে অসীমের দিকে যাত্রা করিয়া চলিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার দেশবাসীকেও ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। কবি জানেন যে গতি স্থগিত হইলেই আবিলতা ও আবর্জনা জমিবে—মৃত্যু উপস্থিত হইবে। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন—

"আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে?
রৈল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে!"

কবি জানেন পরিবর্তনের দ্বারা মন নবনবায়িত হয়, যৌবন স্থায়িত্ব লাভ করে। কবি ইহা উপলব্ধি করিয়া গাহিয়াছেন—

"পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নদীর যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।"

গতিশীলতার এই গান ছন্দোলালিত্যে ও শব্দৈশ্বর্যে বাংলা কাব্যসাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথের এই গতি কিন্তু লক্ষ্যহীন নহে, তাহা 'প্রভাতের সিংহদ্বার পানে' ছুটিয়াছে।

"পূরবী" ও "মহুয়া" কাব্য দুইখানি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। কিন্তু এই দুইখানি কাব্যের সকল কবিতাতেই প্রৌঢ়ত্বের পরিপক্কতা সত্ত্বেও তারুণ্যের রঙ ধরিয়াছে—প্রত্যেক কবিতার মধ্য দিয়া চিরতরুণ কবিমানসটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তরুণ বয়সে রচিত "সোনার তরী" প্রভৃতি কাব্যে কবির যে উদ্দাম কল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গী দেখিয়াছি, প্রৌঢ় পরিণত বয়সের রচনা এই "পূরবী" ও "মহুয়া" কাব্যে আবার যেন তাহারই পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই।

"বনবাণী"তে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিবিড়তম পরিচয়ের বিস্ময় আছে। "পুনশ্চ", "পরিশেষ" প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। "পুনশ্চ" গ্রন্থখানি গদ্যকাব্য—অর্থাৎ, গদ্যের ভঙ্গীতে রচিত কবিতাবলী। গদ্যে লেখা হইলেও ইহার মধ্যে একটি ছন্দ আছে, তাল আছে—হিল্লোলিত কবিতার রস ত' আছেই। এই ধরণের রচনা কবির এক নূতন সৃষ্টি। গদ্যের মধ্য দিয়াও কাব্যের ছন্দ যে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলা যায়, তাহা এই ধরণের কাব্য রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

জগতে যাহা কিছু ছোট, যাহা কিছু তুচ্ছ ও সামান্য, তাহাকেও কবি অসামান্য বলিয়া জানিয়াছেন। কবির "পুরাতন ভৃত্য" কবিতার কৃষ্ণকান্ত,

"রাজা ও রাণী" নাটকের ভৃত্য শঙ্কর, "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" গল্পের ভৃত্য রাইচরণ, "দুই বিঘা জমি"র মালিক দরিদ্র উপেন—সকলেই কবির মনকে স্পর্শ করিয়াছে, কেহই তাঁহার কাছে নগণ্য নহে। সমাজে যাহারা সামান্য ও সাধারণ, প্রবল সহানুভূতিবশে তাহাদের মধ্যেও কবি অসাধারণতা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাদের চরিত্রের মধ্যে যে মহত্ত্ব, মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য কবি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা অনেক সময়ে তাঁহার কাব্যে, গল্পে ও নাটকে তিনি রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি। রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ যেন নব কলেবর লাভ করিয়াছে। প্রকৃতিকে কবি তাঁহার কাব্যে আপন মনের মাধুরী দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া নূতন রূপ দান করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতি কবির নিকট জড় নহে; উহা প্রাণময়ী। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত—সকল ঋতুর বর্ণনায় কবি অনুপম সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে বর্ষা-সম্বন্ধীয় কবিতাই রূপে-রসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কালিদাসের মত রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ বর্ষার কবি। তিনি তাঁহার বিশ্বপ্রকৃতি-সম্বন্ধীয় কবিতার ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রকৃতি ও মানুষের জীবন একসূত্রে গাঁথা আছে। প্রকৃতির সহিত মানুষের অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়া কবি গাহিয়াছেন—

"স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।"

জল-স্থল-আকাশের সহিত একটি নিবিড় একাত্মতাবোধ, নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির নব নব বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া বিলাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাতেই আছে। কবি অনুভব করিয়াছেন, প্রকৃতির সহিত মিলনে আনন্দ—বিচ্ছেদে দুঃখ ও বিষাদ।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমিক। বাল্যকাল হইতেই কবির দেশানুরাগ যে কত প্রবল ছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার "জীবনস্মৃতি"তে এবং তাঁহার বহু কবিতায় পাওয়া যায়। শত অত্যাচারক্লিষ্ট ভারতবাসীর হীন অবস্থা, দাস্য ও নিশ্চেষ্টতা কবির চিত্তকে পীড়িত করিয়াছে। স্বদেশের যে-সব লোক নীরবে শত শতাব্দীর

অত্যাচারের ভারে পিষ্ট হইতেছে, অথচ কোনও প্রতিকার করিতে পারিতেছে না, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে:
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে,—"

বঙ্গমাতা স্নেহাধিক্যে ক্রমাগত বিধি-নিষেধের গণ্ডি দিয়া সন্তানদের পঙ্গু ও নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; কবি তাহাতে ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি॥"

নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ না করিলে বাঙালীর আর মুক্তি নাই। সেইজন্য নববর্ষে কবি সমস্ত ভারতবাসীর হইয়া সংকল্প করিতেছেন—

"নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ, পরের বসন, তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা।"

এই দীক্ষাই মনুষ্যত্বের দীক্ষা।

দেশপ্রেমিক কবি স্বদেশ-জননীর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন—

"নিজ হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে, তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে, তাহে লজ্জা ঘুচে॥"

পরের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার শাক-অন্নেও তুষ্টির নামই মনের স্বাধীনতা। বঙ্গভূমিকে ভালবাসিয়া কবি বারবার বলিয়াছেন -

"আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"

এবং

"তোমার ধূলামাটি অঙ্গে মাখি' ধন্য জীবন মানি।"

বঙ্গদেশে জন্মিয়া কবি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন

"সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এ দেশে,
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে!"

স্বদেশভক্ত কবি ভারতের তথাকথিত উচ্চ-নীচের মধ্যে কৃত্রিম ভেদ ও বিরোধ দূর করিবার কথা বলিয়াছেন। এই সকল ভেদ ভুলিলে, তবেই আমাদের পরাধীনতার গ্লানি ঘুচিবে। এই ভেদবুদ্ধি কবির চিত্তকে এতই অধীব করিয়া তুলিয়াছিল যে, জাত্যভিমানীদের উদ্দেশে কবির সতর্কবাণী অভিশাপের মত নির্ঘোষিত হইয়াছে--

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের ক'রেছো অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমে কোনরূপ সংকীর্ণতা ছিল না, অতীত গৌরবের প্রতি অন্ধ মোহ ছিল না এবং বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষও ছিল না। কবির "ভারত-তীর্থ" কবিতাটি বিশ্বজনীন উদার মনোভাবের অপূর্ব নিদর্শন। ভারতবর্ষকে তিনি বলিয়াছেন "ভারত-তীর্থ"। এই পুণ্য-তীর্থ ভারতবর্ষকে কবি সকল জাতির মিলনক্ষেত্র রূপেই বন্দনা করিয়াছেন, সেখানে মিলিত হইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন—

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।

এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরে।
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

রবীন্দ্রনাথ চির-তরুণ। এই চির-তরুণ কবি তারুণ্যের জয়গান করিয়াছেন "বলাকা"র প্রথম কবিতায়

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের কবি। তিনি তাঁহার বিভিন্ন কবিতায় সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে নানা রূপে নানা ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কবি জীবনকে নব নব রূপ ও রূপক দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মরণকেও তিনি অভিনব রূপ, মাহাত্ম্য ও মাধুর্য দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশের কোনও কবি মরণকে এমন বরণীয় বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই—

"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান!"

অভিনব ভাব-কল্পনার সহিত অপরূপ ছন্দের সম্মিলনে রচিত রবীন্দ্র-কাব্য বাংলা সাহিত্যের এক নূতন সম্পদ। সংস্কৃত সাহিত্যের রসমাধুর্য এবং ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে মিলিত হইয়া অপূর্ব

আনন্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন—

"বিশ্বের মাঝে ঠাঁই নাই বলে কাঁদিছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের কোলে ঠাঁই করে দাও তুমি।"

কবির সেই কামনা সফল হইয়াছে।

কেবল কাব্য-সাহিত্য কেন, বাংলা নাট্য-সাহিত্য, উপন্যাস-সাহিত্য, ছোট গল্প, প্রবন্ধ-সাহিত্য প্রভৃতিও রবীন্দ্রনাথের দানে সুসমৃদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য রচনার বিশেষত্ব আছে। তিনি নাটক রচনায় সাধারণতঃ প্রচলিত আদর্শের অনুসরণ করেন নাই। "বিসর্জন", "ফাল্গুনী", "অচলায়তন", "ডাকঘর", "রাজা", "মুক্তধারা", "তপতী", "মায়ার খেলা", "বাল্মীকি-প্রতিভা", "মালিনী", "চণ্ডালিকা", "শারদোৎসব", "নটীর পূজা" প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ নাটক। এই সকল নাটক ঘটনা-প্রধান নহে, ভাব-প্রধান। এইগুলিতে কোন একটি চিরন্তন সত্যকে নাটকীয় রূপ দান করা হইয়াছে। গীতিবহুলতাও রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। উপন্যাসের ভিতর দিয়া তিনি সমাজের বহু সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন এবং পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া সেগুলি বিশ্লেষণ করিয়াও দেখাইয়াছেন। "গোরা", "ঘরে বাইরে", "নৌকাডুবি", "চোখের বালি", "শেষের কবিতা", "যোগাযোগ", "দুই বোন", "চার অধ্যায়" প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। এই সকল উপন্যাসের ভাষা যেমন স্বচ্ছ, বর্ণনাকৌশল তেমনি চমৎকার। চরিত্র-চিত্রণেও রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিশেষত্ব লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না। চরিত্র-চিত্রণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ নরনারীর মনোজগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই পথে তিনি বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছেন। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া চরিত্র অঙ্কন রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে ছিল না বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ছিল রোমান্স; আসল উপন্যাসের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথ-রচিত "নষ্টনীড়" ও "চোখের বালি" হইতে।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি বাস্তবিকই অতুলনীয়। যে ছোট গল্পে আজ বাংলা সাহিত্য জগতের প্রধান সাহিত্যগুলির প্রায় সমকক্ষ -তাহার সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছ" হইতে। এমন সুন্দর ছোট গল্প বিশ্বসাহিত্যে খুব অল্পই আছে। রবীন্দ্রনাথ কবি, সেইজন্য তাঁহার ছোট গল্পগুলিতেও প্রচুর কাব্যসম্পৎ বিদ্যমান। জীবনের অভিজ্ঞতার বাস্তব পরিচয় বহন করিলেও তাঁহার ছোট গল্পে আমরা পাই সুদূরবিহারী কল্পনার প্রসার এবং ভাবে-ভরা সঙ্গীতময় ভাষার হিল্লোল। কবির অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ন। এই দৃষ্টির স্বচ্ছ আলোকে মানব-হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের অপর বিশেষত্ব এই যে, তিনি আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাগুলিকেই একটা অপূর্ব রহস্যময় রূপ দান করিয়াছেন। ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরের মধ্যে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া চরিত্র-চিত্রণ-পটুতাও রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ। 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'মাস্টার মহাশয়', 'শুভা', 'পোস্টমাস্টার', 'ছুটি', 'অতিথি' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প। "গল্পগুচ্ছে"র প্রত্যেকটি গল্পই হীরকখণ্ডের মত ভাস্বর।

সমালোচনায় ও প্রবন্ধ-সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর জ্ঞান, সহৃদয়তা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত প্রবন্ধাবলী ভাষার ঐশ্বর্যে, রচনাভঙ্গীর অভিনবত্বে ও ভাব-গভীরতায় বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধকবি, তাঁহার সকল রচনাতেই কবি, প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি কবি। তাই তাঁহার প্রবন্ধ বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যশাখার প্রবর্তন করিয়াছে। কবির লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধ সরস হইয়া উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। যুক্তির সহিত অনুভূতির সুন্দর সরস সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির এক বিশেষত্ব। সেখানে তত্ত্ব কিছু কম নাই, তথ্যও হয়তো বহুল

পরিমাণে পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহার চেয়েও বড় জিনিষ কবির সূক্ষ্ম আদর্শবাদ, কল্পনার প্রসার, অভিনব মৌলিক দৃষ্টি এবং প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে অনেক সময় মনে হয়, তিনি সত্য প্রকাশ করিয়াছেন যুক্তি ও তর্কের সহজ পথে নয়, সৌন্দর্যের বক্রপথে। শেষ বয়সের রচনায় বক্রোক্তি ও ব্যঞ্জনার প্রাধান্য ঘটিয়াছে প্রবন্ধগুলিতে। "সাহিত্য", "লোক সাহিত্য", "বিচিত্র প্রবন্ধ", "সমাজ", "স্বদেশ", "শিক্ষা", "ধর্ম", "পঞ্চভূত" প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ-গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলি কবির লেখনীর যাদুদণ্ডস্পর্শে সরস-সুন্দর হইয়াছে। "বিশ্বপরিচয়" ও "শব্দতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ দুইখানি যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক। বাংলা ভাষাতত্ত্বের কোন কোন মৌলিক সূত্র রবীন্দ্রনাথই প্রথম চিন্তা ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এমন কোন দুরূহ বিষয় নাই, রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোক-স্পর্শে যাহা স্পষ্ট, উজ্জ্বল হইয়া ধরা দেয় নাই।

"ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী", "রাশিয়ার চিঠি", "জাপান যাত্রীর ডায়েরী", "যাত্রী", "ছিন্নপত্র" প্রভৃতিতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। কবির সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে এই সকল গ্রন্থও অবশ্যপাঠ্য।

ইংরাজী ভাষার উপর রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ দখল ছিল। তিনি নিজেই তাঁহার বহু কবিতার ও গদ্যগ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। সেগুলি ইয়োরোপে ও আমেরিকায় বিশেষ সমাদরও লাভ করিয়াছে। ইংরাজীতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, গল্প ও উপন্যাস পাঠ করিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশবাসী মুগ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের অন্যান্য নানা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনা অনূদিত হইয়া বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলায় মূল রবীন্দ্র-কাব্যের রসাস্বাদ করিবার আগ্রহও পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর কম নহে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার মানসে ইয়োরোপের কেহ কেহ আজকাল বাংলা শিখিয়া থাকেন; ইয়োরোপের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে

রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং বাংলা ভাষা অধ্যাপনার ব্যবস্থাও আছে। ইহা বাংলার বিশেষ সম্মানের কথা, সন্দেহ নাই।

আজ রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের এই খ্যাতির কারণ প্রধানত দুইটি। প্রথমতঃ, তাঁহার সাহিত্যের রস-বস্তুর সার্বজনীনতা। উহার মধ্যে এমন একটি সর্বমানব-সাধারণ আবেদন আছে, যাহার ফলে বিশ্ববাসী ইহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিকতা এই বিশ্বজনীনতাকে পরম শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির আর একটি কারণ- তাঁহার বিশ্বভ্রমণ। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে কবির চিত্ত যেমন প্রসার লাভ করিয়াছিল, দৃষ্টিশক্তি প্রখর ও সৃষ্টিশক্তি অফুরন্ত হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার যশ দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সর্বজন-পরিচিত ও প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব অনুরাগ, অপার আনন্দ এবং দুর্দমনীয় উৎসাহ ছিল। বালক বয়স হইতে পরিণত বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন,-সেই সকল দেশে তাঁহার বাণী, ভারতের বাণী পেঁছাইয়া দিয়াছেন। কবির বাণী শুনিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে, কৌতূহলী হইয়া কবির কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে।

কবি তাঁহার প্রথম যৌবনে তাঁহার প্রতিভা উন্মেষের সমকালেই তাঁহার জীবনের ব্রত নির্দেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন

"আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা।"

কবির এ কামনা সার্থক হইয়াছে। কত মহাদেশ, সমুদ্রপারের কত দ্বীপ, অসংখ্য নগর ও লোকালয়--এ সব বারংবার অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানবের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছেন। সমগ্র জীবনে কবির সৃষ্টির যেমন বিরাম ছিল না, তেমনি বারবার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া এই ভারতভূমির আধ্যাত্মিক সাধনার বাণী প্রচার করিতেও তাঁহার কোন আলস্য ছিল না।

বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণস্পৃহা জাগরিত হইয়াছিল। একাদশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার পিতার সহিত হিমালয়-ভ্রমণে যান। পনের বৎসর

বয়সের সময়ে তিনি পুনরায় তাঁহার পিতার সহিত হিমালয়-দর্শনে গমন করেন। সতের বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার মধ্যম অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে বোম্বাই প্রদেশের আহম্মাদাবাদ নগরে অবস্থান করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি শিক্ষার্থিরূপে ইংলণ্ডে গমন করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের বহু দেশে ভ্রমণ করেন। ভ্রমণে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের দেশভ্রমণ তাঁহার শিক্ষা, আনন্দ ও কবিতার উৎস ছিল। বিশ্বভ্রমণে তিনি যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা কৃপণের ধনের মত নিজের অন্তরমধ্যে লুকাইয়া রাখেন নাই, সমগ্র বিশ্বে বিতরণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালে বৌদ্ধাচার্যেরা যেমন ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনার বর্তিকা সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তেমনি কেবল এশিয়াতে নহে, ইয়োরোপে ও আমেরিকায়, সমগ্র বিশ্বে,—ভারতের সাধনা, মুক্তি ও শান্তির বাণী প্রচার করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-পরিভ্রমণ বিভিন্ন দেশে অসাধারণ উদ্দীপনা আনিয়াছিল। পৃথিবী জুড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে লইয়া উৎসব-সমারোহের অন্ত ছিল না। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালী, রাশিয়া, আমেরিকা, পারস্য, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, চীন, জাপান—কত দেশে গিয়াছেন! যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই রাজকীয় সমারোহময় সম্মান ও সংবর্ধনা লাভ করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে একবার তিনি একাদিক্রমে তের মাস ইয়োরোপে ও আমেরিকায় ভ্রমণ করেন। তাঁহার এই ভ্রমণ-অভিযান বিশ্বজয়ের অভিযানের তুল্য। এ অভিযান ভূমি-জয়ের জন্য নয়, তার চেয়ে ঢের বড়, সমগ্র জগতের হৃদয়রাজ্য জয়ের জন্য।

কবিকে দেখিবার জন্য, তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য ইয়োরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বক্তৃতাদানের আসরে, পথে-ঘাটে, রেল স্টেশনে -সর্বত্র বিপুল জনসমাগম হইত। রাজ-সন্দর্শনের জন্যও বোধ হয় কোন দেশে এমন জনসমাগম হয় না।

পৃথিবীর বহু দেশে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারত ও ভারতীয়দিগের প্রতি যে দেশ শ্রদ্ধান্বিত নহে, সে দেশের আমন্ত্রণ কবি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে দেশে কবি কখনও পদার্পণ করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ক্যানাডার অন্তর্গত ভ্যানকুভার হইতে তথায় গমনের জন্য কবির নিমন্ত্রণ আসে। কিন্তু ক্যানাডায় ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞামূলক নীতি প্রচলিত থাকায় কবি তথায় যাইতে অস্বীকার করিয়া ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। যে দেশে তাঁহার স্বদেশবাসী অবজ্ঞাত হয়, কবি সেই দেশে যাইতে সম্মত হন নাই। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ এমনই নিবিড় ছিল। স্বদেশবাসীব অপমানকে তিনি নিজের অপমান মনে করিতেন। অস্ট্রেলিয়াতেও ভারতীয়গণ অবজ্ঞাত ও নির্যাতিত হইত, এইজন্য রবীন্দ্রনাথ অস্ট্রেলিয়া-ভ্রমণেও যান নাই।

বিশ্বভ্রমণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংলার ও বাঙ্গালীর, তথা ভারতের মর্যাদা বিশ্বজগতে বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্যুতিতে অপরূপ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দৈবীপ্রতিভা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে এক সহস্র বর্ষের সমৃদ্ধি দান করিয়াছে!